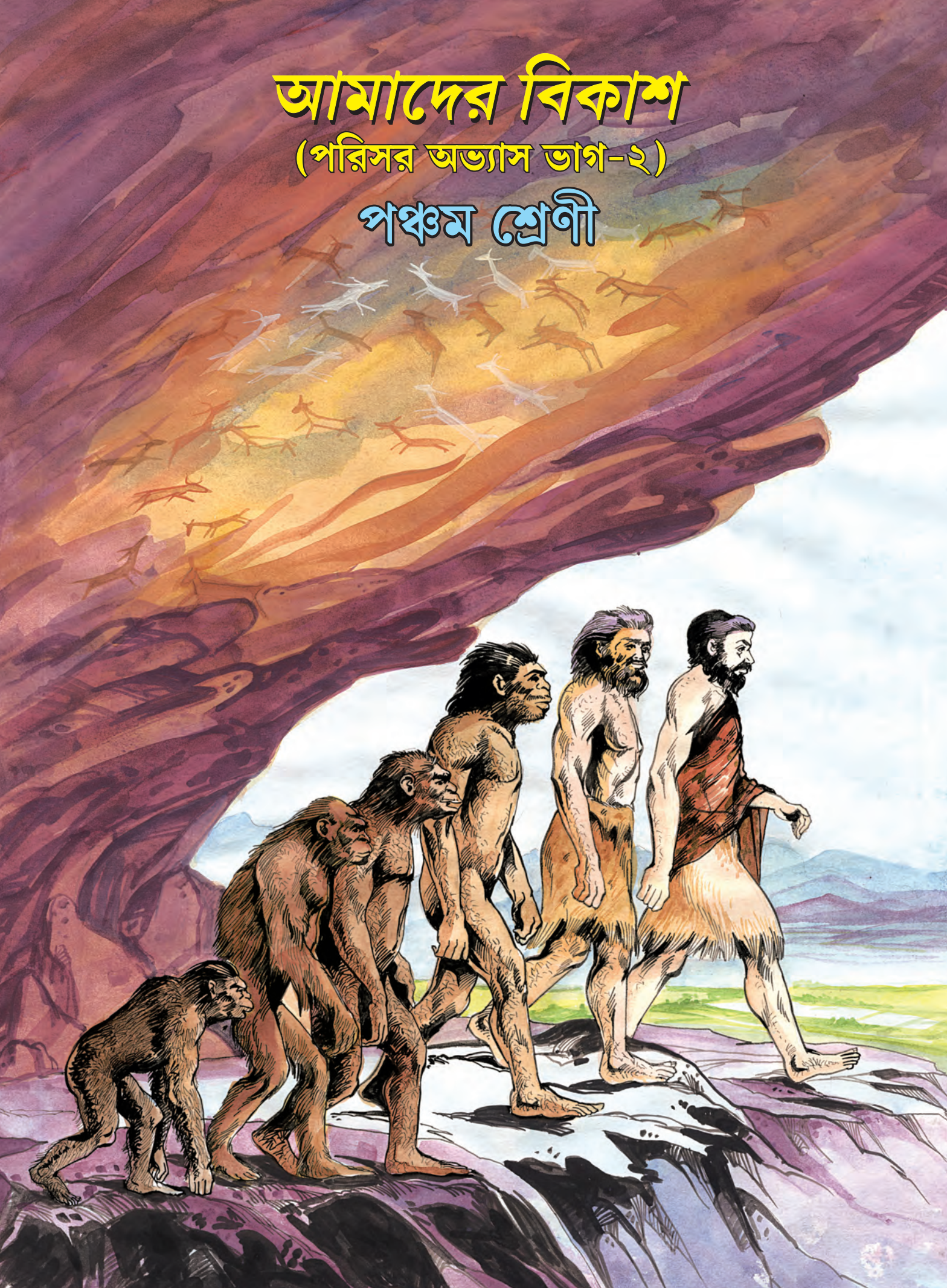


আমাদের বিকাশ

(পরিসর অভ্যাস ভাগ-২)

পঞ্চম শ্রেণী



ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

- (ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;
- (খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে ;
- (গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহিতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে ;
- (ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বাত হলে সাড়া দিতে হবে ;
- (ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে ;
- (চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে ;
- (ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে ;
- (জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে ;
- (ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;
- (ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উর্ধ্ব এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উর্ধ্বের জন্য সচেষ্ট হতে হবে ;
- (ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।



শিক্ষা বিভাগের অনুমতি ক্রমাংক :
প্রাশিসং/২০১৪-১৫/১৪৮/অনুমতি/ড-৫০৫/৩৪১ তারিখ ২০ জানুয়ারী ২০১৫

আমাদের বিকাশ

(পরিসর অভ্যাস ভাগ - ২)

পঞ্চম শ্রেণী



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতা ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে।



আপনার স্মার্টফোনের 'DIKSHA APP' দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার QR Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2021

Reprint : 2022

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুणे-৪১১০০৪।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন পর্যদের কাছে এই বইয়ের সর্ব অধিকার থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সংচালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল এনার লিখিত অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না।

ইতিহাস বিষয় সমিতি :

ডা. আ.হ. সাডুংখে, অধ্যক্ষ
ডা. সদানন্দ মোরে, সদস্য
ডা. হরি নরকে, সদস্য
অ্যড. গোবিন্দ পানসরে, সদস্য
শ্রী আব্দুল কাদির মুকাদম, সদস্য
ডা. গণেশ রাউত, সদস্য
শ্রী সম্ভাজী ভগত, সদস্য
শ্রী প্রশান্ত সরুডকর, সদস্য
শ্রী মোগল জাধব, সদস্য-সচিব

ইতিহাস বিষয় কার্যগট সদস্য :

ডা. শুভাংগনা অত্রে
ডা. মঞ্জুশ্রী পবার
প্রা. দেবেন্দ্র ইংগড়ে
প্রা. প্রতিমা পরদেশী
প্রা. যশবন্ত গোসাবী
শ্রী সঞ্জয় বঝরেকর
শ্রী রাহুল প্রভু
শ্রী সন্দিপ বাকচৌরে
শ্রী মুরগেংদ্র দুগালী
শ্রী অরুণ হড়বে
প্রা মোহসিনা মুকাদম
ডা. এস.আর.বঝে

সংযোজক :

শ্রী মোগল জাধব, বিশেষাধিকারি
ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র

শ্রীমতী বর্ষা কাংবড়ে,
সাহায্যক বিশেষাধিকারি, ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র

লেখিকা : ডা. শুভাংগনা অত্রে

মুখপৃষ্ঠ ও সাজসজ্জা: প্রা. রাহী কদম

মানচিত্রকার : শ্রী রবিকিরণ জাধব

ভাষান্তর সংযোজন: ডা. অলকা পোতদার

বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা, পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুणे
সহায়ক সংযোজন : সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা,
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুणे

বাংলা পরিসর অভ্যাস বিষয়তত্ত্ব

শ্রী তপন সরকার, শ্রী রঞ্জিত গাঙ্গুলী, শ্রী অসিমকুমার
বিশ্বাস, শ্রী দেবদাস ফৌজদার, শ্রী সুজিত দাস,
শ্রী নারায়ণ মল্লিক, শ্রী দিপঙ্কর সানা, শ্রী বিজয়
মল্লিক, শ্রী অমর বিশ্বাস, শ্রী জনক সরকার,
শ্রী নিত্যানন্দ বাল, শ্রী সনৎ দেবনাথ, শ্রী নারায়ণ
দাস, শ্রী নির্মল পাল, শ্রী হরেন্দ্রনাথ শিকদার,
শ্রী অতুল বাল, শ্রী অনিল বারই, শ্রী মহাদেব দে

নির্মিতি :

শ্রী সচ্চিদানন্দ আফলে, মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী প্রভাকর পরব, নির্মিতি অধিকারী
শ্রী শশাংক কণিকদড়ে, নির্মিতি সহকারী অধিকারী

অঙ্কর বিন্যাস :

পিসি গ্রাফিক্স, মুম্বাই

কাগজ :

৭০ জী, এস. এম. ক্রীমভোব,

মুদ্রাদেশ :

মুদ্রক :

প্রকাশক :

শ্রী বিবেক উত্তম গোসাবী,
নিয়ন্ত্রক, পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মন্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বাই-২৫

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম

এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য

ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে,
আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল
সপ্তমী, সম্ভূত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই
সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ॥

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-
বোন ।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের সমৃদ্ধি
এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি
সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি
সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও
দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো । তাদের কল্যাণ এবং
সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত ।

প্রস্তাবনা

‘রাষ্ট্রীয় অভ্যাসক্রম এবং বালকের মৌলিক শিক্ষা অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯ রচনা ২০০৫’ ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ‘প্রাথমিক শিক্ষা অভ্যাসক্রম ২০১২’ রচনা করা হয়েছে। এই অভ্যাসক্রম ২০১৩-১৪ শৈক্ষনিক বর্ষ হইতে ক্রমগত শুরু করা হয়েছে। অভ্যাসক্রমের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সামান্য বিজ্ঞান, নাগরিকশাস্ত্র ও ভূগোল এই বিষয় একত্রিত করে পরিসর অভ্যাস ভাগ-১ এর মধ্যে সমাবেশ থাকবে। ইতিহাস এই বিষয় পরিসর অভ্যাস ভাগ-২ এর মধ্যে স্বতন্ত্র বিষয় ইহা নির্দিষ্ট আছে। মূল মরাঠী পরিসর অভ্যাস ভাগ-২ পাঠ্যপুস্তকের নির্মিতী বর্ষ ২০১৫ তে তৈরী করা হয়েছে। বাংলা ভাষিক ছাত্র-ছাত্রীদের আবশ্যিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বাংলা ভাষায় পরিসর অভ্যাস ভাগ-২ পাঠ্যপুস্তকটি প্রথম আবৃত্তি করা হলো। প্রস্তুত পাঠ্য পুস্তকটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ অনুভব হচ্ছে।

পঠন-পাঠনের দিকে বাল্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, স্বশিক্ষনের লক্ষ্য রেখে প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্তিমে শিক্ষার্থী বিহিং ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, আনন্দদায়ক পঠন-পাঠনের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা হয়েছে। ইতিহাস একটি শাস্ত্র ইহা প্রথম থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষনের জন্য পাঠ্য পুস্তকে রচনা করা হয়েছে। আদিমানব থেকে আধুনিক মানবের উন্নতির জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশ অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ভূমিকা এটা বুঝতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের আরম্ভ ইতিহাস মানে কি? এই প্রশ্ন দ্বারা হয়েছে। কালখন্ডের সংকল্পনা না জেনে ইতিহাস বোঝা কঠিন। এই জন্য কালখন্ডের সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানব তার প্রয়োজন অনুসারে সাধনের নির্মিতী করেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে-সাথে পরিবেশে পরিবর্তন হয়েছে। এইজন্য মানুষের কাজ-কর্ম ও সাধনের পরিবর্তন হয়েছে। ‘প্রগত বুদ্ধির মানুষেরা নগরের সংস্কৃতি প্রগত আবশ্যিকতা অনুসারে ইতিহাসের পরম উচ্চ বিন্দু। মানুষের প্রগতির জানকারি প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে। পাঠের শেষে চৌকটে দেওয়া জানকারি শিক্ষার্থীদের পঠন অধিক পরিণামকার হবে। মাত্র এই জানকারির উপর প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পালকের জন্য আলাদা আলাদা সূচনা দেওয়া হয়েছে। অনুশিলনী নিরশতা না হয় এর জন্য বিবিধতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। পঠন অধিক কৃতিশিলতা ও উপক্রম মূলক হওয়ার জন্য কৃতি ও উপক্রমের সমাবেশ করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকটি যাহাতে নির্দেশ এবং উচ্চস্তরের তৈরী করার জন্য পুরাতত্ত্ব ডা. এম.কে. ঢবড়ীকর ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিবিধ শিক্ষনবিদ ও বিষয়-বিশেষজ্ঞ দ্বারা পাঠ্যপুস্তকটি বার-বার সমিক্ষন করা হয়েছে। সমিতি ও কার্যগটের অভিপ্রায় নিয়ে পাঠ্যপুস্তকটির অন্তিম স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।

মন্ডলের ইতিহাস বিষয় সমিতি, চিত্রকার, ছায়াচিত্রকার, অথক পরিশ্রম করে পাঠ্যপুস্তকটি তৈরী করেছে। পাঠ্যপুস্তক পর্যদ এদের সকলের প্রতি মনঃপূর্বক কৃতজ্ঞতা জানায়। শিক্ষার্থী, শিক্ষকগণ, অভিভাবক এই পাঠ্যপুস্তকটিকে স্বাগত করবে এইরূপ আশা করি।

পুণে

তারিখ : ১ মে ২০২১

ভারতীয় সৌর : ২০ চৈত্র, ১৯৪৩

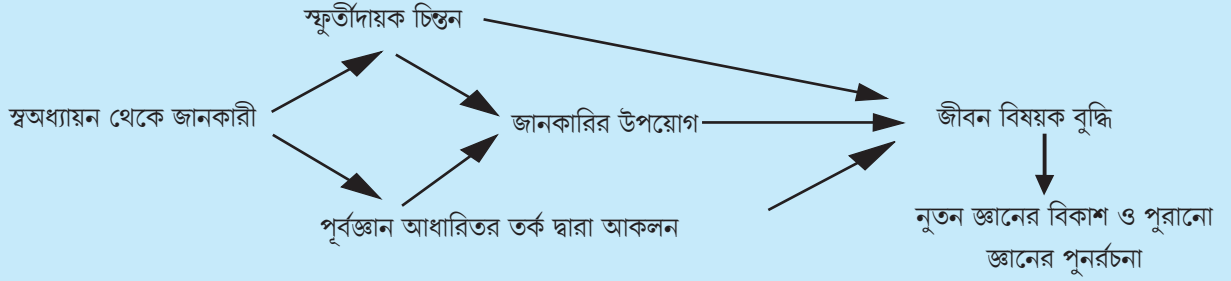

(দিনকর পাটীল)

সঞ্চালক

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

– শিক্ষক ও অভিভাবকের জন্য –

শিক্ষা মানুষের মেরুদণ্ড। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবন উন্নতি হয়েছে এই ধারণা শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানরচনাবাদী শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায়। পাঠ্য পুস্তকটি রচনা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবককে কেন্দ্র করে ত্রিসূত্রে রচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থী তাদের নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অনুভবের পাঠ ঘটক একে-অপরের সাথে জোড়া রাখা হয়েছে। দৈনিক পঠন পাঠনের জন্য পারিপূর্ণরূপে সাধ্য করার জন্য পাঠ্য পুস্তকের রচনা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিত রচনা নিম্ন প্রাকারে প্রস্তুত করা যায়।



উপরোক্ত সর্ব ঘটক সামনে রেখে প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকের রচনা করা হয়েছে।

- » ছাত্র - ছাত্রীদের নিজ জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অধ্যয়ন করার জন্য প্রেরিত করবে। এবং এক ঘটক থেকে অন্য ঘটক সহজভাবে বুঝতে পারে ও প্রেরিত করার জন্য দক্ষতা নিয়ে চেষ্টা করবে।
- » আগের পাঠের সঙ্গে সামনের পাঠের স্বরূপ মিলিয়ে, তার নিবারণ দ্বারা সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয় বাল্য মনে স্পষ্টরূপে আকলন করিয়ে দেবে। ইতিহাস শাস্ত্র বিষয় মনের প্রতিবিম্বে বসানোর অভিরূচি নির্মাণ করবে।
- » জ্ঞান রচনাবাদ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা সাহায্যকর হবে, এমন চিত্র, চৌকটে দেওয়া জানকারী শিক্ষার্থীদের পঠন অধিক পরিণাম হবে। শুধুমাত্র এই জানকারীর উপর প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয় না। শিক্ষক ও অভিভাবকের এই জানকারী দৃষ্টান্তের জন্য সাহায্যকর হবে।
- » পাঠ্যপুস্তকে মূখ্যপৃষ্ঠ, অক্ষর এবং চৌকটে অতিরিক্ত জানকারী বিশেষ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। ইহা করার সময় দৃশ্য সাংস্কৃতিক ঘটনা উপযুক্ত ও পরিণামকারক করার বিচার করা হয়েছে। তর্ক সংগত চিন্তা বিচার শক্তি জাগৃত করার পার্শ্বভূমিকা নিয়ে লেখা হয়েছে। তাতে অভিজ্ঞতা আনার জন্য শিক্ষক ও পালকের কল্পকতা উপযোগী হবে, এই ভূমিকা কেবলমাত্র সংক্রমণ ও অসুবিধা না হয়ে সকলের জন্য মার্গদর্শন ও উপযুক্ত হয়ে উঠবে।
- » জ্ঞানরচনাবাদ শিক্ষাপদ্ধতিতে বালক-বালিকা একে-অপরের সঙ্গে বার্তালাপ করা অভিব্যক্তি অভিরূচি প্রকট করার মহত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠ্য ঘটকের অনুসারে উপক্রম দ্বারা সম্ভব হবে। প্রত্যেক শিশু স্বতন্ত্র সুপ্ত জ্ঞান ও প্রতিভা নিয়ে আসে, তারজন্য বালক-বালিকাদের ছোট-ছোট সমূহ তৈরী করে, প্রত্যেক সমূহে এক আলাদা-আলাদা উপক্রম দেবে। এবং উপক্রমের সমূহ চর্চা দ্বারা নিজ মত বার্তালাপ, অভিব্যক্তি ক্ষমতার বিকাশ হবে। এবং শুধু তা নয় এক বিষয়ের অনেক অঙ্গ থাকে। ইহা বুঝতে পারে ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি, সুপ্তগুণ কুশলতার বিকাশ হয়।
- » পরিসর এবং সংস্কৃতি এর খুব নিকটের সম্বন্ধ থাকে। ইহা পাঠ দ্বারা বোঝাবে। উপক্রম দ্বারা তার সম্বন্ধে অধিক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।
- » পাঠ্যপুস্তকে পাঠের শেষে দেওয়া প্রশ্ন ইহা নমুনা প্রশ্ন রূপে দেওয়া হয়। মূল্যায়ন সত্যতাপূর্ণ ও সফলভাবে সম্পূর্ণ হবে, তার জন্য শিক্ষক এরকম প্রশ্নের অনুসার প্রশ্নসমূহ তৈরী করে ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন-উত্তর দ্বারা বুঝিয়ে দেবে।

পরিসর অভ্যাস ভাগ ২ পঞ্চম শ্রেণী

সূচনানুসারে অধ্যয়নকালীন শিক্ষাগত প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন নিষ্পত্তি
অধ্যয়নার্থীদের অধ্যয়ন অনুভাবের সুযোগ প্রদান করে উপযুক্ত সমূহে / একজন বা দুজন / ব্যক্তিগত ভাবে নিম্ন কার্যের জন্য উৎসাহিত করাবেন। - বিভিন্ন স্থানের নিরীক্ষণ করে, তার বিষয়ে তথ্য সংকলন করে সহপাঠি, শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে চর্চা করো ও অনুভাব বর্ণনা করো। - পরিসরের বিভিন্ন বিভাগ / সংস্থা উদা: ব্যাঙ্ক, জল বিতরণ বিভাগ, আরোগ্য কেন্দ্র, আপত্তি নিবারণ কেন্দ্রে গিয়ে সেখানের অধিকারীদের সঙ্গে চর্চা করবে ও সেই-সেই সংস্থার সম্বন্ধে কাগজ পত্র ব্যবহার এর অর্থ জেনে নেবে। - বিভিন্ন প্রদেশে, ভিন্ন-ভিন্ন কাল খন্ডের অন্ন, নিবাস, জলের ব্যবস্থা, উদর নির্বাহ করার সাধন, রীতি রিবাজ পরম্পরা এরকম সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানার জন্য চিত্র, বস্তু সংগ্রহালয় গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে চর্চা করবে, ও এই মার্গের অবলম্বন করবে। - রাত্রি নিবাস, ছাওনীতে থাকা লোক, বৃদ্ধাশ্রম গিয়ে নিরীক্ষণ করবে। বৃদ্ধ / অপঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে আলাপ আলোচনা করবে ও যারা নিজ উদর নির্বাহনের সাধন পরিবর্তন করে, তাদের সঙ্গে চর্চা করবে। তাদের মূলনিবাসস্থান কোথায়? যেখানে তাদের পূর্ব পুরুষগণ বছরের পর বছর বসবাস করছে, ওই প্রদেশ তারা কেন ছেড়েছে, লোকের স্থানান্তর ও পরিসরের তৎসম প্রশ্নের চর্চা করবে। - উৎক্রান্তির (পরিবর্তন) সংকল্পনা বুঝে নেবে। - আদিমানব হতে আধুনিক মানবের বিকাশ সম্বন্ধে জেনে নেবে। - সকলের কল্যাণের জন্য নিম্নার্থরূপে কর্ম করা ব্যক্তির জীবনী তার অনুভব ও প্রেরনা জেনে নেবে।	অধ্যয়নার্থী - 05.95B.01 আমাদের দৈনিক জীবনে তন্ত্রজ্ঞানের ব্যবহার ও মূলভূত আবশ্যিকতা পূর্ণ করার জন্য (জল, অন্ন, ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা স্পষ্ট হয়। দৈনিক জীবনে বিবিধ সংস্থার ভূমিকা ও কার্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয়। (ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়ত, সহকারী সংস্থা, পুলিশ স্টেশন ইত্যাদি) 05.95B.02 অতীতকাল ও বর্তমানকালের রীতি রিবাজ (আচার-বিচার) প্রথা, সংস্কৃতি তন্ত্র এর পরিবর্তন (সিকি, মুদ্রা, চিত্র শিলা স্মারক, বস্তু সংগ্রহালয় ইত্যাদি) জেষ্ঠ ও বড়দের সঙ্গে চর্চা করে বুঝে নেওয়া। 05.95B.03 নিরীক্ষণ দ্বারা অনুভব প্রশ্নের আধারে মত-প্রকাশ করে। রীতি রিবাজ। ঘটনা প্রসঙ্গ সমাজের কঠিন প্রশ্নের সম্বন্ধ মিলিয়ে নেয়। (উদা: প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবহার / মালিকানা অধিকার ও ভেদাভেদ, স্থানান্তর ও বিস্তারিত, বহিষ্কার হওয়া, বাল হক) ইত্যাদি বুঝে নেওয়া। 05.95B.04 মানবের পরিবর্তন স্তর (টপ্পা) বলতে পারা। 05.95B.05 আদি মানব থেকে আধুনিক মানব পর্যন্ত এর বিকাশের ঘটনা জেনে নেওয়া।

সূচিপত্র

পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্র.
১. ইতিহাস কাকে বলে ?	১
২. ইতিহাস এবং কালখন্ডের জানকরী	৬
৩. পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি	১২
৪. বিবর্তন	১৫
৫. মানবের উন্নতি	১৯
৬. পাষান যুগ : পাথরের অস্ত্র	২৫
৭. গৃহ হইতে গ্রাম - বস্তী পর্য্যন্ত	৩০
৮. স্থায়ী জীবন যাত্রার শুভারম্ভ	৩৪
৯. স্থায়ী জীবন এবং নগরীয় সভ্যতা	৩৯
১০. ঐতিহাসিক কালখন্ড	৪৫

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2014. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

১. ইতিহাস কাকে বলে ?

১.১ ইতিহাস :- অতীতের সর্ব ঘটনার অভ্যাস
বা জ্ঞান অর্জিত করা শাস্ত্র ।

১.২ ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

১.৩ ইতিহাস এবং আমরা

১.৪ অতীত এবং ভবিষ্যৎ

**১.১ ইতিহাস :- অতীতের সর্ব ঘটনার অভ্যাস
বা জ্ঞান অর্জিত করা শাস্ত্র ।**

গত বছর আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রপতি
শিবাজী মহারাজের চরিত্র, শিবাজী মহারাজের
দ্বারা স্বরাজ্য স্থাপনার কার্য পড়েছি। শিবাজী
মহারাজের জন্মের পূর্বের কথা। ইহাকে আমরা
‘চারশ’ বর্ষ প্রাচীন অথবা চার শত বর্ষের পূর্বের
ঘটিত ঘটনা বলতে পারি।

আমরা আমাদের সুবিধামত কাজ, ব্যাপার,
সময় মত ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিতে বিভাজন করি।
যখন আমরা ‘এখন’ “কিছু সময়ে আগে”-কিছু

সময় পরে অথবা আজ-কাল-পরশু এই ভাবে,
এই বছর-আগামী বছর ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ ব্যবহার
করি। কখনো - কখনো আমরা নিজেদের সুবিধা
মত সময়ের গননা করতে থাকি। এইরূপ শব্দে
“এখন - এই বছর - শব্দ দ্বারা বর্তমান কালের
বোধ হয়। কিছু সময় আগে - কাল - গত বছর
এই ধরনের শব্দের অর্থ অতীত কালের বোধ হয়।
কিছু সময় পর - কাল - আগামী বছর ইত্যাদি
শব্দের অর্থ - ভবিষ্যৎ কালের বোধ হয়। ঘটিত
ঘটনা কথার অর্থ অতীত কাল। এখন যে সময়
চলছে - তাকে বর্তমান কাল বলা হয়। ভবিষ্যৎ
কালের অর্থ সামনে যে ঘটনা ঘটবে।

অতীতকালের মধ্যে যদি কোন ঘটনা ঘটে
থাকে। যেমন - আজ আমার বয়স দশ বছর।
এর অর্থ এই হয় কি আমার জন্ম দশ বছর পূর্বে
অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমার আয়ু - দশ বছর পরে
বিশ বছর হবে।



অতীতকাল
জন্ম দশ বছর পূর্বে



বর্তমানকাল
আজ আমার বয়স দশ বছর



ভবিষ্যকাল
আমার বয়স বিশ বছর
হবে। দশ বছর পরে।

আমাদের জন্মের দিন থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ঘটিত সময়ের মানে এক ব্যক্তির জীবনের অতিত কালের সংবোধ বুঝায়। তাকে অতীতকাল বলে। সাধারণত কথায় আমরা বলে থাকি যে, যে পুস্তক পাঠ করলে অতীতের সব ঘটনা জানা যায় তাকে ইতিহাস বলে।

১.২ ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর “পরিসর অভ্যাস” অধ্যাপন বিষয়ের দ্বারা আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে পরিচিত হয়েছি। ইতিহাস বিষয় ও বিজ্ঞান বিষয়ে সম্বন্ধিত। ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোন ঘটনাকে প্রয়োগ করে বার বার প্রায়োগিক পদ্ধতি দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রমানিককে আলাদা - আলাদা মূল্যায়ন করে তার নিকষের উপর পরিক্ষন করার পর, এটা বিশ্বাসবস্তু বা বিশ্বাসনীয় আছে কি না পরোক্ষ করার পর সত্যতা তথ্য সামনে রেখে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে জানা। ইহাকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে।

কখনো-কখনো আমাদের জন্মের পরের ঘটনা আমাদের মনে থাকে না বা মনে রাখি না। কিন্তু আমাদের ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, মা-বাবা, আমাদের নিকটবর্তী আত্মীয় - স্বজনে আমাদের

ছোট বেলার ঘটিত ঘটনা আমাদেরকে বলে থাকে বা বলে। এই সমস্ত কথা তাহাদের মনে থাকে, তাহারা কখনো ভুলে যায় না। পরিবারের লোক একই কথা সবাই ঘটিত ঘটনার কথা ভিন্ন-ভিন্ন রূপে আমাদের শোনায়। আমরা লক্ষ্য দিয়ে শুনি। কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি বলার মধ্যে একটু কম-বেশী বলে বা বলার ভিন্নতা পাওয়া যায়। এই সময় আমাদের মনে একটু দুবিধা হয় যে-এর মধ্যে কোন কথাটি পূর্ণত সত্য এখন সত্যতা নিধারিত করার জন্য ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

অতীতকালের সমস্ত ঘটিত ঘটনা যেকপে-সেরূপ ঘটনা ক্রম করা কোন ভাবে সম্ভব নয়। ইতিহাসের কথা প্রস্তুত করার পদ্ধতি অন্য বিজ্ঞান বিষয়ের থেকে একেবারে ভিন্ন। ইতিহাসের ঘটনা ক্রম, ইতিহাসের প্রমানিক খোঁজ নিরিক্ষন এবং তথ্যের মিলন করা এই উদ্দেশ্য হেতু ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এরজন্য নিশ্চিত জানকারী প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে অন্য শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এইজন্য সমস্ত ইতি তথ্যের বিচার করে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান বিষয়। ইতিহাস কেবলমাত্র কল্পনা করে লেখা যায় না, সত্যতা থাকা দরকার।



বর্তন



পয়সা / মুদ্রা



তাম্রপট



গ্রন্থ এবং পান্ডুলিপি

ঐতিহাসিক সাধন

প্রাচীন বস্তু, ঘর, শিল্প, বর্তন, মুদ্রা, পাথরের উপর লেখা, তাম্রপট, গ্রন্থ, পান্ডুলিপি মানুষের রূপকথা-লোক গীত, ভিন্ন-ভিন্ন ঘটিত ঘটনার কথা সমস্তই ইতিহাসের প্রমুখ সাধন। এই সমস্ত ইতিহাসের সাধনগুলিকে ভৌতিক, লিখিত এবং মৌখিক রূপে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অতীতকালে কি এবং কিভাবে ঘটেছে, ইহার সত্যতা খোজার জন্য এই সাধনের দ্বারা যে সত্যতা প্রমানিক ভাবে মূল্যায়ন করা যায়। মূল্যায়নের মাধ্যমে যদি সত্যতা শিদ্ধ হয় তাহলে প্রমানিক কালক্রমানুসারে মিলিয়ে ইতিহাস লেখা হয়। এটাই ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সত্যতা মূল্যায়ন না করে কখনো ইতিহাস লেখা যায় না। সব ঘটনা প্রমানিক হওয়া দরকার।

১.৩ ইতিহাস এবং আমরা

বিজ্ঞানের অভ্যাস করলে আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর পাই। যেমন পর্যাবরন বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্বলন, ক্ষতি, প্রদূষণ ও অনান্য সমস্যার জানকারী প্রাপ্ত করি। জানকারী প্রাপ্ত করার পর সমস্যা কি করে নিবারন করা যায় তার উপর খোজ করা। প্রত্যেক ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞান নিজ নিজ বিষয়ের অধ্যাপন করে। কিন্তু ইতিহাস সবসময়ে অতীতের ঘটনার অভ্যাস করে।

ব্যক্তি, ব্যক্তিগত এবং সামুদায়িক কাজের পরিণাম মানবীয় সমাজে উন্নতি বা অবনতি, লাভদায়ক বা ক্ষতিকারক এই সমাজে নির্মাণ হয়। এর বিপরীত পরিণাম আমাদের সমাজে প্রতিদিন মানবের জীবনে ফলিত হয়। যদি কোন একটি গ্রামের লোক এক সাথে মিলে একে অপরের সহযোগিতা করে তাহলে সেই গ্রামের উন্নতি বা বিকাশ হবেই। কিন্তু কখনো - কখনো দেখা যায় যে, গ্রামের লোক একজুটতা না হয়ে একে অপরের সহযোগিতা না করে তাহলে সেখানে গ্রামের উন্নতি বা বিকাশ কার্যে বাধা নির্মাণ হয়।

অতীতকালে মানবীয় সমাজের আচার - বিচার এবং কার্য প্রণালীর খোজ করতে - করতে ইতিহাসের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। ইতিহাসের অভ্যাস করলে ইতিহাসের মাধ্যমে

মানবীয় সমাজের উন্নতির জন্য ভাল-মন্দ ইহার খোজ করা তথ্য জানা সম্ভব হয়। ইতিহাসের অভ্যাস করলে আমরা জানতে পারি কি বর্তমানে আমাদের আচরন কি ধরনের হওয়া দরকার। বর্তমানের বিচার করে ভবিষ্যতের নির্মাণ কি ভাবে করতে পারবো এটা জানা যায়। পূর্বে কি কম ছিলো বর্তমানে কি আছে, ভবিষ্যতে তাহা কি দিয়ে পূর্তি করবো।

অতীতকালে মহান-মহান লোকের চরিত্রের মাধ্যমে আমরা মনে নতুন প্রেরনা, স্মৃতি পাই। নতুন চরিত্রবান কার্য করার প্রেরনা ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজের সংস্কৃতি বা অপরের সংস্কৃতির আদান-প্রদান এবং মানবীয় সংস্কৃতি বিকাশের একটি নতুন রাস্তা খুজে পাই। এই খোজার মাধ্যমে মানব জাতির জীবন উন্নত জীবনমান পরিবর্তনের একটি রাস্তা খুজে নেয়। নিজে পরিবর্তন হলে প্রতিবেশী পরিবর্তন হবে। প্রতিবেশী পরিবর্তন হলে সম্পূর্ণ গ্রাম পরিবর্তন হবে।

প্রত্যেক গ্রাম, তহসীল, জেলা, রাজ্য এবং দেশের একটি নিজ নিজ ইতিহাস আছে। এইভাবে পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, জলাশয়, প্রানীজগৎ, মানবজগৎ সবারই নিজ নিজ একটি ইতিহাস রচিত আছে।

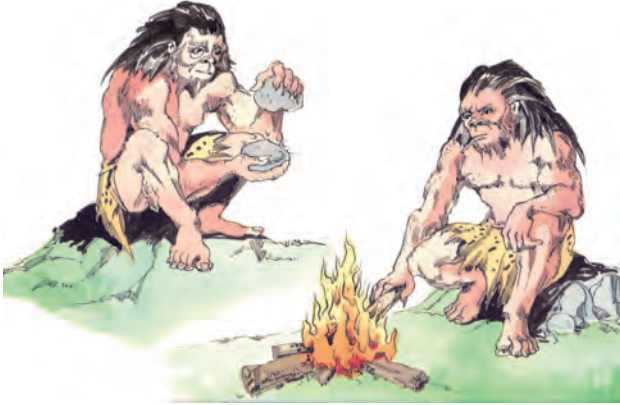
প্রত্যেক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের আধার নিয়ে আমরা মানবীয় সংস্কৃতির মহত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক গন নতুন-নতুন আবিষ্কার করেন এবং বিভিন্ন আবিষ্কার বিষয় আমরা জানকারী প্রাপ্ত করি।

১.৪ অতীতকাল এবং ভবিষ্যকাল

বিভিন্ন ঘটনা - ঘটনাক্রম ক্রমশঃ ক্রমানুসারে অতীতকাল-বর্তমানকাল এবং ভবিষ্যকাল একে অপরের সঙ্গে জড়িত আছে। যেমন ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্ত করার জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহার পরিণামে ভারত ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা পেয়েছে।

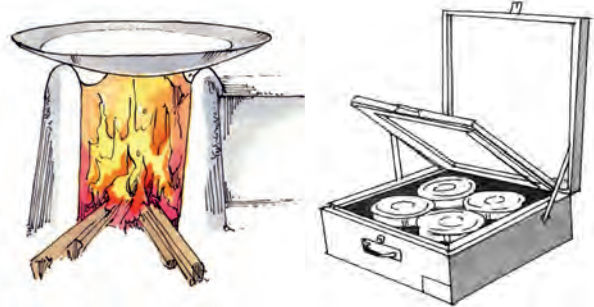
আমরা এটা ও বলতে পারি যে স্বাধীনতা। প্রাপ্ত করা কঠিন ব্যাপার নয় কিন্তু স্বাধীনতাকে পালন করা কঠিন ব্যাপার। অথক পরিশ্রমের ফলে ভারত ইংরেজদের নিকট হতে স্বাধীনতা পেয়েছে।

আমাদের পরিবেশের পূর্বে বা আগে ঘটেছে এরূপ অনেক ঘটনা আমাদের মানব জীবনের সঙ্গে জড়িত আছে। ইতিহাসের ঘটনাকে আমরা জানতে পারি কি অতীতের ঘটনা ভবিষ্যকালের সঙ্গে জড়িত আছে। সময় পরিবর্তনশীল, যুগ পরিবর্তন শীল, সৃষ্টির সব কিছু ধীরে-ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। পূর্বে কি ছিল, কেমন ছিল, আগে কেমন হবে এর থেকে আরো ভালো কি করে করতে হবে এটাই পরিবর্তন। যেমন প্রাচীনকালে মানব নিজের আসে পাসের পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সাহিত্য থেকে অস্ত্র-শাস্ত্র বানানোর কলা কৌশল শিখেছিলো। এই শেখা সে নিজেই শিখে ছিল, পাথর-পাথর দিয়ে আগুন তৈরী করা, আগুনের প্রয়োজন কি? আগে গিয়ে মানুষ চাকা তৈরী করল।



অতীতকালে আবিষ্কার বা শিল্প বিজ্ঞান

মানুষের মনে ধারণা হলো বংশানুবংশ বিকাশের জন্য পরিবর্তন দরকার। মানুষ ধীরে-ধীরে শারিরীক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে-সাথে নতুন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানের প্রতি অগ্রগতি হতে লাগলো। এই পরিবর্তন কৃতি আজ ও চলছে, চলবেও। অতীতকে কেন্দ্র করে নতুনের আবিষ্কার হওয়া এটা একটা প্রকৃতির গুন। আর এটাই চিরসত্য। অতীতকালে আবিষ্কার হয়েছে এবং নতুন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান বর্তমানকালে আবিষ্কার হয়েছে এবং নতুন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান সামনে রেখে নতুন-নতুন শাস্ত্রীয় খোজ করতে সম্ভব হবে।



বর্তমানকালে আবিষ্কার বা শিল্প বিজ্ঞান

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- (অ) যে পুস্তক পাঠ করিলে অতীতের সব ঘটনা জানা যায় তাকে..... বলে।
- (অ) ইতিহাস কেবল মাত্র করে লেখা যায় না।

২) একটি বাক্যে উত্তর লেখো।

- (অ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাহাকে বলা হয়?

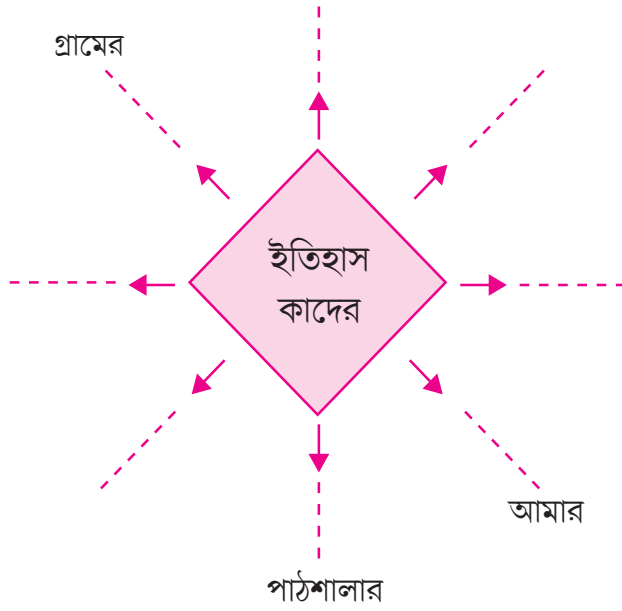
- (আ) স্বাধীনতা প্রাপ্ত করা কোন ঘটনার পর নির্ভর করে?

- (ই) ইতিহাসের অভ্যাস করলে কি জ্ঞান পাওয়া যায়?

৩) সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো।

- (অ) ইতিহাস বিষয় ইহা একটি বিজ্ঞান এমন কেন বলা হয়েছে?
- (আ) গ্রামের উন্নতিতে বাধা কি কারনে হয় তাহা স্পষ্ট করো?

৪. কাল্পনিক চিত্র তৈরী করো।



ভৌতিক	লিখিত	মৌখিক

উপক্রম

- (অ) পরিবেশের আসে-পাসে যে কোন ঐতিহাসিক ভবন, রাজমহল, মন্দির, প্রাচীন ধার্মিক স্থল, যদি থাকে তাহলে তাহার জানকারী প্রাপ্ত কর এবং চিত্র সংগ্রহ কর।
- (আ) তোমার বিদ্যালয়ের ইতিহাস জানবার জন্য তুমি ইতিহাসের কোন সাধনের ব্যবহার করবে। সাধনের সূচি তৈরী কর এবং লেখ, সাধনের মাধ্যমে তুমি কি কি জানকারী পেয়েছ।
- যেমন - বিদ্যালয় ছাপনার উদঘাটনীয় (শিলান্যাস)। সময়, দিন, বার, উদঘাটক ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৫ নিচের কোষ্টকে ঐতিহাসিক সাধনগুলির বর্ণীকরন করো।

ঐতিহাসিক সাধন - মূদ্রা, পত্র ব্যবহার, ক্রিলা, দুর্গ, বর্তন, তাম্রপট, রাজবাড়ি, শিলালেখ, লোকগীত, স্তম্ভ, চরিত্র গ্রন্থ, গুহা, লোক কথা।

এটা তোমার জানা আছে কি ?

প্রাচীনতথ্য

প্রাচীনকালে বিভিন্ন মানব সমাজের দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন, অনেক সাহিত্য, ভবন, ঘর ইত্যাদি মহত্বপূর্ণ জিনিসের অবশেষ ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। কখনো-কখনো পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে ভূমির উপরে ও খুঁজে পাওয়া যায় বা ভূমির অন্তর্ভাগে খোদায় করার সময় পাওয়া যায়। কখনো-কখনো অতিবৃষ্টির কারনে জল প্রবাহিত হওয়াতে, অতিবৃষ্টির কারনে মাটি বয়ে যাওয়াতে, কখনো-কখনো তীব্র হাওয়াতে ধূল কনা মাটি জমে যাওয়ার কারনে মাটির নিচে অবশেষ পড়ে যায়। মনুষ্য দ্বারা তৈরী বিভিন্ন সাহিত্য, ভবন, ঘর, প্রাণির অস্তিপাঞ্জার, এই ভাবে মাটির নিচে জমা হয়ে যায়। এই ধরনের অবশেষকে পুরাতথ্য বলে। পুরা কথার অর্থ পুরাতন।

প্রাচীনকালের বিভিন্ন সাহিত্য ভবন, ঘর বা অবশেষ বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানে যে বিষয় নিয়ে অভ্যাস করা হয় তাকে পুরাতথ্য বিজ্ঞান বলে। প্রাচীন অবশেষের খোজ এবং বিশ্লেষণ যে করে তাকে পুরাতথ্য বিশেষজ্ঞ বলে। মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে এমন সাহিত্যের খোজ বিশেষজ্ঞরা খুব সাবধানে মাটির এক-এক পরত খনন করে এবং সেই মাটির নিরিক্ষণ করে মাটির নিচের চেপে পড়ে আছে অবশেষের পরীক্ষা করে। এই বিধীকে পুরাতথ্যীয় উৎখনন বলে অথবা খনন বলে। যেখানে পুরা অবশেষ পাওয়া যেতে পারে সেখানে বিশেষজ্ঞরা মাটির উৎখনন করে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে সেখানে মাটির উৎখনন সূরু করা হয়। উৎখনন পূর্বে নিয়োজন, ব্যাবস্থা, সংগ্রহ বিধির ধ্যান রাখা হয়।

উৎখননের পূর্বে বিশেষজ্ঞগন বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে।

- ১) যে অবশেষ পাওয়া গিয়াছে সেটি কোন কালখন্ডের ?
- ২) পাওয়া গিয়াছে অবশেষটি কোন সংস্কৃতির বা কোন সভ্যতার ?
- ৩) তাদের দৈনিক জীবনের রিতি-রিকাজ, ভোজন, আচার-বিচার কেমন ?
- ৪) অন্য সংস্কৃতির লোকের সঙ্গে তাদের সভ্যতার মিলন কেমন ?
- ৫) দৈনিক জীবনের ব্যবহারের জিনিস, লোক জীবন, তাদের ভাষা, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবন যাপন কেমন ?

২. ইতিহাস এবং কালখন্ডের জানকারী

- ২.১ কাল বিভাজন এবং কালখন্ড রেখা।
- ২.২ কালগণনা এবং কালগণনার পদ্ধতি।
- ২.৩ ইতিহাসের কাল বিভাজন।
- ২.৪ কালগণনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কাল নির্ধারন।

২.১ কাল বিভাজন এবং কালখন্ড রেখা

কালখন্ড শব্দের অর্থ জানার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কাল নিরন্তর, কাল কখনো থামে না কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধানুসারে কালের বিভাজন করি। কালের বিভাজন আমরা কেন বা কিসের উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য করি এটা কালখন্ড বিভাজনের উপর নির্ভর করে। সূর্য উঠার পর আমরা বলি দিন শুরু হয়েছে, সকাল হয়েছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমরা বলি সূর্য ডুবে গেছে, সন্ধ্যা হয়েছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছু সময় পর অন্ধকার হয়ে যায় তখন আমরা বলি রাত হয়েছে। এর অর্থ বোঝা যায় যে আমরা সময়ের নির্ধারন করি। এই নির্ধারনের অর্থ আমরা সময়কে দিন এবং রাত এই দুই ঘটকে বিভাজন করি।

পৃথিবী নিজের গতিতে নিজের কক্ষের মধ্যে ঘুরছে। পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে পরিক্রমা করছে। সূর্য নিজে প্রকাশিত। সূর্যের কিরন নিরন্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়াতে জীব সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যের প্রকাশ নিরন্তর হওয়া সত্ত্বেও আমরা শুধু দিনের বেলায় সূর্যের প্রকাশ দেখতে পাই। আর রাতে সূর্যের প্রকাশ দেখতে পাই না। ইহা কি করে হয়? এটা মনে প্রশ্ন জাগে।

পৃথিবী সর্বদা নিজের কক্ষে যখন পরিক্রমা করে তখন তার পৃষ্ঠভাগ সূর্যের সামনে আসে। যখন সামনে আসে তখন প্রকাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এর বিপরিতে যে পৃষ্ঠভাগ সূর্যের সামনে

থেকে দূরে চলে যায় বিপরিত ভাগে অন্ধকার থাকে। পৃথিবী নিজের কক্ষে একবার পরিক্রমা পূর্ণ করতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগে। এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২ ঘন্টা দিন আর ১২ ঘন্টা রাত হয়। এই ভাবে একদিন আর একরাত মিলে যে সময় হয় এই সময়কে এক দিন বলে। এক দিন অর্থাৎ এক দিবস ও বলে।

সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সাত দিনের এক সপ্তাহ হয়। দুই সপ্তাহ মিলে এক পক্ষ হয়। চার সপ্তাহ অর্থাৎ দুই পক্ষ মিলে এক মাস এবং বারো মাসের এক বছর হয়। এই নিয়ম ধরে আমরা কালের বা সময়ের ক্রমিক বিভাজন করি। একের পর এক বছর শেষ হতে-হতে একশত বছর কেটে যায়, অর্থাৎ এক শতাব্দী বর্ষ পূর্ণ হয়ে যায়। এইরূপ দশ শতাব্দী বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর হাজার বর্ষ পূর্ণ অর্থাৎ সহস্র বর্ষ পূর্ণ হয়ে যায়। কালখন্ডের এই ধরনের বিভাজনকে একরেখিয় বিভাজন বলে।

ইসবী সনের কালখন্ড : একরেখিয় বিভাজন একের পর এক বছর ক্রম হিসাবে রাখা হয়। ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে ও প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটনাক্রম হিসাবে রাখা হয়। ইহার জন্য ইসবী সন লেখা হয়। একরেখিয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আমরা যে দিনদর্শিকা ব্যবহার করি সেটা ইসবী সন অনুসারে। বার-তারিখ, মাস-বছর সব কিছু ইসবী সন পদ্ধতিতে লেখা। ইসা মসিহ এর স্মরণার্থে ইসবী সনের আরম্ভ হয়। বাংলাতে ইসবী সনের অর্থ ইসা বোঝা যায়। যে বছর থেকে ইসবী সন আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে সেই বছর ইসবী সনের প্রথম বছর মানা হয়। সেই বছরের আরম্ভ ১ সংখ্যা দ্বারা বোঝানো হয়। এর পরে প্রত্যেক বছরকে ক্রমানুসারে

সংখ্যা দিয়ে দেখান হয়। ইসবী সনের প্রথম একশ বছর অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী বছরের কালক্রম ইসবী সন - ১-১০০ লেখা হয়। ইসবী সনের প্রথম সহস্র বছরের কালাবধি কে ইসবী সন - ১-১০০০ এই ভাবে লেখা হয়।

ইসা পূর্বের কালখন্ড :

ইসবী সনের আরম্ভের আগের কালখন্ডকে ইসা পূর্ব কালখন্ড বলা হয়। এই কালখন্ডের বর্ষের গণনা করার সময় প্রত্যেক বছরের বর্ষ ক্রম সংখ্যা অবরোহী ক্রমে রাখা হয়। ইসা পূর্বের প্রথম শতাব্দী বর্ষের আরম্ভ ইসা পূর্ব ১০০ বর্ষ হয়েছে এবং এই শতাব্দী বর্ষ ইসা পূর্ব ১ বর্ষ শেষ হয়েছে। অতএব ইসা পূর্বের আগে একশ বছর অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী বছরের কালক্রম ইসা পূর্ব ১০০-১ এবং ইসা পূর্বের হাজার বর্ষের কালক্রম এর অর্থ ইসা পূর্ব ১০০০-১।

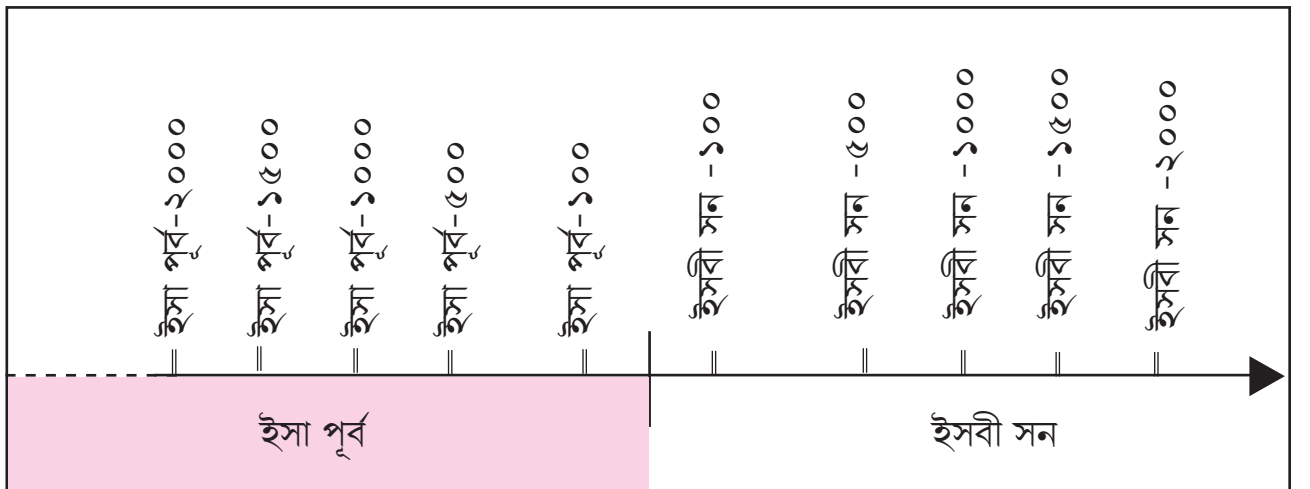
ইসা পূর্বের কালক্রমকে লেখার জন্য আমরা নিচের পদ্ধতি বা উদাহরনের সাহায্যে লেখি বা বুঝতে পারি। বর্ধমান মহাবিরের জীবন কাল ইসা পূর্ব ৫৯৯ থেকে ৫২৭ এই ভাবে লেখা হয়। গৌতম বুদ্ধের জীবন বৃণ্ডান্ত

ইসা পূর্ব ৫৬৩ থেকে ইসা পূর্ব ৪৮৩ এভাবে লেখা হয়।

২.২ কাল গননা এবং কাল গননার পদ্ধতি

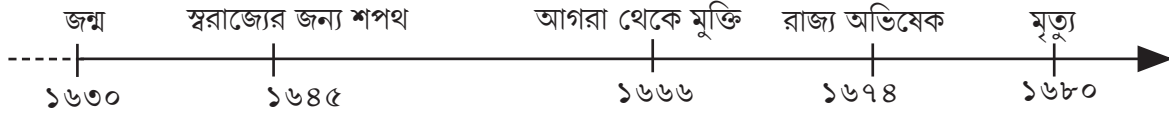
কাল গননা করার অর্থ কাল খন্ডের অধিক সময়ের গননা। কালখন্ডের গননা করার যে একক নিয়ম আমরা জানি তাহা এই প্রকারের - সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর, শতাব্দী, সহস্র। এরমধ্যে সেকেন্ড সবথেকে ছোট একক। সম্পূর্ণ পৃথিবীতে কালগননার অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এইসব প্রচলিতের মধ্যে ইসবী সন প্রণালী সব থেকে অধিক প্রচলিত প্রণালী। সাধারণত দেখা যায় যে-যে কোন মাসের তারিখ অথবা তিথি লিখতে সময় আমরা ওই দিনের ক্রমাংক, ওই মাসের ক্রমাংক অথবা নাম লিখতে হয়। তারিখ শব্দ ইহার সমানার্থী শব্দ বোঝায়।

কাল গননার জন্য দ্বিতীয় প্রণালী ও আছে। এর আগে ও আমরা দেখেছি ইসবী সনের আরম্ভ। ইসা মসিহা থেকে শুরু হয়েছে। কোনো বিশষ্ট ঘটনাকে মনে রেখে নতুন কাল গননা শুরু করার প্রথা পূর্বে ও ছিল।



যেমন কোনো এক পরাক্রমী রাজার রাজ্যভিষেক করার বিশেষ ঘটনা ক্রম লিখে রাখা হয়। চতুর্থ শ্রেনীতে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ তার নিজের রাজ্যভিষেক সন ১৬৭৪ সালে রাজ্যভিষেক পর্ব আরম্ভ করেছিলেন। এটা আমাদের সবার জানা আছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত এই সাড়ে চার আরব বর্ষের বিশাল কালখন্ডের ইতিহাস জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এরজন্য ইতিহাসের এই কালখন্ডকে ভিন্ন - ভিন্ন কালখন্ডে বিভাজন করেছে। প্রথম চরন প্রাগৈতিহাসিক ও অপরটি ঐতিহাসিক কালখন্ড।



ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ তার জীবনের মহত্বপূর্ণ ঘটনাক্রম (১৬৩০ থেকে ১৬৮০)

ভারতে ‘শালবাহন শক’ ‘এবং বিক্রম সাবন্ত’ খুব প্রচলিত কাল গণনাকার। ইসলাম ধর্মের সংস্থাপক ‘মুহম্মদ পৈগম্বর’ মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর করেছিলেন। এই স্থানান্তর সময় থেকে ‘হিজরী’ কাল গণনা শুরু হয়। ভারতের পারসি সমাজের কাল গণনায় যে নিয়ম ব্যবহার করে এই নিয়মকে ‘শাহশাহ’ বলে।

২.৩ ইতিহাসের কাল বিভাজন।

ইতিহাস বিষয় আমাদের অতীত কালের সমস্ত ঘটনার জ্ঞান দেয় এমন একটি বিষয়। এর সম্বন্ধে আমরা প্রথম পাঠে অভ্যাস করেছি। এছাড়াও আমরা এটা ও জানি কি ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা বা কালখন্ড গত হয়েছে। অতীত কাল ইতিহাসের প্রমুখ কালখন্ড। বিশেষ লক্ষ্য করে জানা যায় যে, ইতিহাসের কালখন্ডের আমাদের পৃথিবীর সৌরমন্ডলের উৎপত্তির আগের কালখন্ড। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। প্রায় সাড়ে চার আরব বর্ষ পূর্বে সৌর মন্ডলের উৎপত্তি হয়েছিল। পৃথিবী এই সৌর মন্ডলের একটি গ্রহ। এর অর্থ এই বোঝা যায় যে পৃথিবীর উৎপত্তি প্রায় সাড়ে চার আরব বর্ষ পূর্বে হয়েছিলো।

১) প্রাগৈতিহাসিক কালখন্ড :- যে কালখন্ডে ইতিহাস লেখার জন্য কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না এইরূপ ধরনের কালখন্ডকে প্রাগৈতিহাসিক কালখন্ড বলে। ‘প্রাক’ কথার অর্থ - কৃত্যুক্ত দ্বারা পূর্ণ করা।

২) ঐতিহাসিক কালখন্ড:- যে কালখন্ডে ইতিহাস লেখন করার জন্য লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাকে ঐতিহাসিক কালখন্ড বলে।

২.৪ কালগণনা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কালনির্ধারণ।

আজ কোন দিন অথবা আজ কত তারিখ, যখন আমরা দিন বা তারিখ নিশ্চিত করি তখন আমাদের কালগণনা করতে হয়। কাল গণনার অনেক পদ্ধতি আছে, তাহা আমরা জানতে পেরেছি। পদ্ধতির দ্বারা কালগণনা আগামী আগে - পিছে ক্রম দেওয়া হয়। যেমন জুন মাস, তাহলে জুন মাসের পরের মাস জুলাই হবে, এইরূপ বুঝে নেওয়া হয়। আজকের তারিখ যদি ১০ হয় তাহলে আগামী দিনের তারিখ ১১ হবে। ১০ তারিখের পূর্বের তারিখ ৯ ছিলো। এই ধরনের তারিখ বা দিনের কালগণনা করি। এই পদ্ধতির অবলম্বন করে আমরা কালখন্ডের লম্বা সূচি তৈরি করি।

ইসবী সন প্রারম্ভ হওয়ার পূর্বের কালখন্ডে ঘটিত যে ঘটনা তার আভ্যাস করার সময় ওই কালখন্ডের উল্লেখ করা থাকে। এর মধ্যে কিছু ঘটনার তথ্য জমির নিচে ভূমিগত অবস্থায় থাকা প্রমানের আধার নিয়ে জানকারী প্রাপ্ত করা হয়। জমির নিচে বস্তু অথবা ভবনের অবশেষ রূপে পাওয়া যায়। এই পুরাতন আবশেষ দ্বারা কত বছর আগের ঘটনা তাহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা খোঁজ করা সম্ভব হয়।

জমির নীচে মাটির এক পরত - দ্বিতীয় পরত এইরূপ অনেক পরত সংচিত থাকে। মাটির পরতের মধ্যে অথবা পরতের মধ্যে অবশেষ পাওয়া যায়। আবশেষের নিরীক্ষন করার পর কোনো কালখন্ডে কোনো সময়ে কোনো তিথিতে তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে না। কিন্তু আজ থেকে এতো বছর পূর্বের

কালখন্ড ইহা নিরীক্ষন করে বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতিকে কালমাপন পদ্ধতি বলা হয়। এই ধরনের কালমাপন করার জন্য ১৪ কর্ব বিশ্লেষণ, কাঠবলয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। অবশেষ অথবা যে মাটির পরতে অবশেষ পাওয়া যায় নিরীক্ষন করার পর, কতো বছর পূর্বে তাহা জানার পর তার কালখন্ড নিশ্চিত করা যায়। যেমন অবশেষে মাটির কোন বর্তন পাওয়া গেল তাহা কত বছর পুরানো নিশ্চিতরূপে জানা যেতে পারে। এই সব নিশ্চিত হওয়ার পর নিশ্চিত কালগণনা করে বলা যেতে পারে যে এই কালখন্ড পাঁচ হাজার বছর পুরানো। কালখন্ড প্রায় তিন হাজার বর্ষ পূর্বের কালমাপন গণনানুসারে ওই বর্তনের সংস্কৃতি কালখন্ড ইসা পূর্ব প্রায় তিন হাজার বর্ষ এই ধরনের বলা যেতে পারে।

অনুশীলনী

১. শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

(অ) আমরা যে কালদর্শিকা ব্যবহার করি সেটা ----- অনুসারে নির্ধারন।

(আ) ইসবী সনের আরম্ভ শুরু হওয়ার পূর্বের কালখন্ডকে ----- বলে।

২. প্রত্যেক প্রশ্নের এক বাক্যে উত্তর লেখো।

(অ) কালগণনার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ?

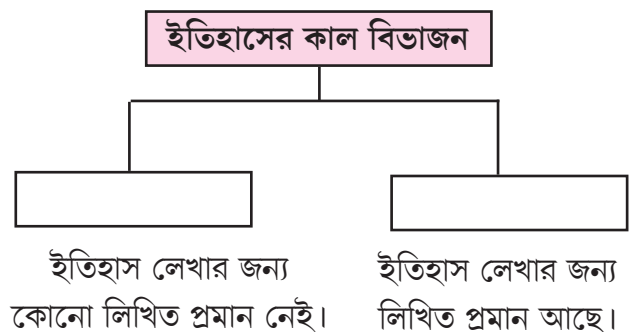
(আ) ইসবী সনের প্রথম একশ বছরের কালখন্ড কিভাবে লেখা হয় ?

৩. নিচের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

(অ) কালখন্ডের একরেখীয় বিভাজন কাহাকে বলে ?

(আ) কালগণনার কি-কি একক প্রণালী, তাহা বিবরন সহ লেখো ?

৪. নিচের সারিনী পূর্ণ করো।



উপক্রম

নিচের দেওয়া মাসিক নিয়োজন অনুসারে তুমি মাসিক নিয়োজন তৈরি করো।

ফেব্রুয়ারী

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
						১
২	৩	৪	৫ ক্রিকেট খেলা	৬	৭	৮ গানের ক্লাস
৯ বন্ধুর জন্ম দিন	১০	১১ পিসিমা আসবে	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮ অঙ্ক পরীক্ষা	১৯ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জয়ন্তী	২০ ঠাকুরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ	২১	২২ গানের ক্লাস
২৩	২৪ গ্রামের মেলা	২৫	২৬	২৭ মরাঠী ভাষা গৌরবদিন	২৮	

তুমি কি জানো ?

অরব : এক অরব অর্থাৎ কত বছর ? একের পরে তিন শূন্য লিখলে ১০০০ আর একের পরে চার শূন্য লিখলে ১০০০০ হয়।

তাহলে $১০০ \times ১০ = ১০০০$ আর $১০০০ \times ১০ = ১০০০০$ হয়।

এখন আমরা দেখব কি - এই ধরনের লেখি পদ্ধতি আরাহী ক্রম লিখলে কেমন হয়।

$১০০ \times ১০ = ১০০০$ (একশ) X (দশ) = (এক হাজার)
$১০০০ \times ১০ = ১০,০০০$ (এক হাজার) X (দশ) = (দশ হাজার)
$১০,০০০ \times ১০ = ১,০০,০০০$ (দশ হাজার) X (দশ) = (এক লক্ষ)
$১০,০০,০০০ \times ১০ = ১০,০০,০০০$ (এক লক্ষ) X (দশ) = (দশ লক্ষ)
$১০,০০,০০০ \times ১০ = ১,০০,০০,০০০$ (দশ লক্ষ) X (দশ) = (এক করোড়)
$১,০০,০০,০০০ \times ১০ = ১০,০০,০০,০০০$ (এক করোড়) X (দশ) = (দশ করোড়)
$১০,০০,০০,০০০ \times ১০ = ১,০০,০০,০০,০০০$ (দশ করোড়) X (দশ) = (এক অরব)



বিলার্ড লিবি

জন্ম - ১৯০৮

মৃত্যু - ১৯৮০



কালনির্ধারণের পদ্ধতি : কর্ব-১৪ সমস্ত জীবিত প্রাণীর শরীরে পাওয়া যায়। জীবিত প্রাণীর মৃত্যুর পর, তার শরীরের কংকালে কর্ব-১৪ মাত্রায় কম হয়ে যায়। প্রাগৈতিহাসিক কাঠ, কয়লা, হাড়, প্রাণী জীবাশ্ম ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে হাওয়ার মাত্রা কম থাকে। ইহার মধ্যে কত প্রমাণ হাওয়া থাকে তাহা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োগশালা দ্বারা করা সম্ভব। অবশিষ্ট বায়ুর আধার নিয়ে এই বস্তুর আয়ু কত তাহা গণনা করা সম্ভব হয়। যে কোন বস্তুর বয়স নির্ধারিত করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে কর্ব-১৪ পদ্ধতি বলা হয়। কালমাপনের জন্য পদ্ধতি ও আছে কিন্তু কর্ব-১৪ পদ্ধতি এক উওম পদ্ধতি মানা হয়। এই পদ্ধতির দ্বারা তথা কালমাপন পদ্ধতির অনুসারে বস্তুর কালখন্ড নিশ্চিত করা সম্ভব হয় বা সহজ প্রথা। এই ধরনের বস্তু যে সংস্কৃতির লোকেরা তৈরী করেছে, সেই সংস্কৃতির কালখন্ড কে এক রেখিয় কালখন্ড রেখা দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাছের বৃদ্ধ হওয়ার সময়ে গাছের প্রতিটি ডাল এক-এক বছরের মধ্যে বড় হতে থাকে। গাছের ডালের গণনা করলে গাছের বয়স কত তাহা বলা যেতে পারে। কাঠের বস্তুর আয়ু গণনা করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিকে ‘কাঠবলয় কালমাপন পদ্ধতি’ বলা হয়।



৩. পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি

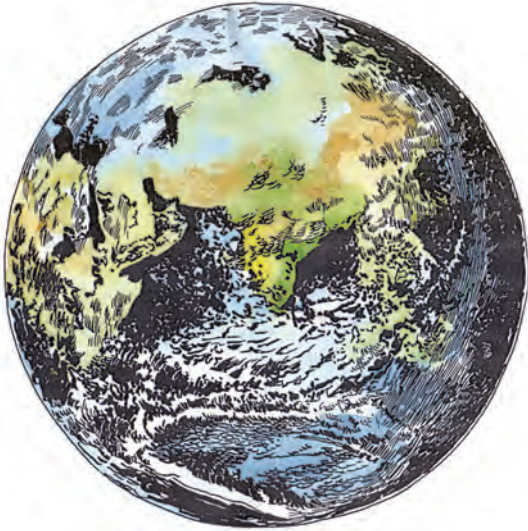
৩.১ পৃথিবীর সৃষ্টি

৩.২ পৃথিবীতে সজীব সৃষ্টি

৩.৩ পৃথিবীর উপর প্রানীজগৎ

৩.১ পৃথিবীর সৃষ্টি(উৎপত্তি)

আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি, এই পৃথিবীর সৃষ্টি(উৎপত্তি) কি করে হয়েছে? এখন পৃথিবীর যে রূপ আছে, এর পূর্বে ও কি এই রূপ ছিলো? না আগের থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে? যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে কি রূপে পরিবর্তন হয়েছে? কি-কি পরিবর্তন হয়েছে?

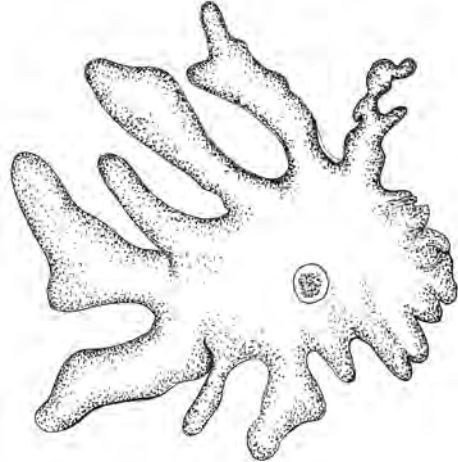


পৃথিবী

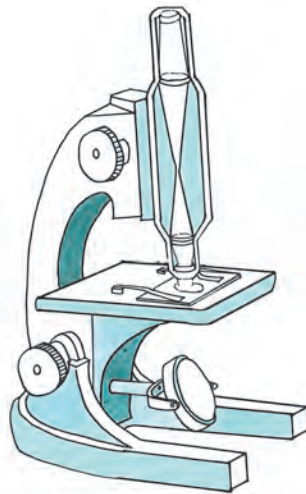
বৈজ্ঞানিক খোঁজে বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান খুঁজে পাওয়া গিয়াছে যে প্রায় সাড়ে চার আরব বর্ষ পূর্বে অন্তরিক্ষে (ব্রহ্মাণ্ডে) বালুকনা ও অতি গরম বায়ুর সংমিশ্রনে একটি বড় বায়ুমণ্ডল তৈরী হয়েছিলো। এই বায়ুমণ্ডলের গতি এত তেজ ছিল যে বায়ুমণ্ডলে বায়ু চক্রপাত গতিতে ঘুরতে লাগলো। তেজ গতির জন্য বায়ুমণ্ডল টুকরো-টুকরো হয়ে সূর্যের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং ঘুরতে লাগলো যার কারনে গ্রহের নির্মান হলো। গ্রহের নাম এইভাবে হলো-১. বুধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচুন

৩.২ পৃথিবীতে সজীব সৃষ্টি

এই নবগ্রহের মধ্যে কেবল পৃথিবীতে সজীব পাওয়া যায়। পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবী পৃষ্ঠভাগ ঠান্ডা হয়ে একটি বড় জলাশয় নির্মান হয়েছে। এই জলাশয় নির্মান হতে কমপক্ষে ৮০ করোড় বছর লেগেছে। এইরূপ শোনা যায় যে, জলাশয়ের কারনে সর্বপ্রথম অনেক প্রকারের এককোশীয় সজীব প্রানী সৃষ্টি হয়েছে। আদিজীব নামে পরিচিত এক কোশীয় সজীবের সৃষ্টি হয়। আদিজীব নামে পরিচিত এই এক কোশীয় সজীব থেকে ধীরে-ধীরে বহুকোশীয় সজীব সৃষ্টি হয়েছে। এক কোশীয় সজীব খুবই সূক্ষ্ম। ইহা খালি চোখে দেখা যায় না। এই ছোট এক কোশীয় সজীবকে দেখার জন্য সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়।



সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্র দিয়ে এককোশীয় সজীব দেখা যায়



সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্র

৩.৩ পৃথিবীর প্রাণীজগৎ

পৃথিবীর উপর সজীব জগতের মধ্যে প্রাণী এবং বনস্পতি পাওয়া যায়। এখন আমরা প্রাণী জীবন সমন্ধে অভ্যাস করবো। এই ধরনের প্রাণীর বিশেষতা সম্বন্ধে জানবো।

১. প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস করে।
২. প্রাণী অন্ন গ্রহন করার জন্য অথবা অন্য কারনের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে।
৩. প্রাণী জাতির মধ্যে কিছু প্রাণীতে ডিম দেয়। ডিম থেকে প্রাণী শিশুর জন্ম হয়। আবার কিছু প্রাণী শিশুর জন্ম দেয়।



প্রাণী জগৎ

১. এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- (অ) এক কোশী সজীব কে দেখবার জন্য
কিসের প্রয়োজন হয় ?
(আ) এক কোশী সজীবের সৃষ্টি কি ভাবে
হয়েছে ?

২. নীচের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

- (অ) সূর্য এবং সূর্যের চারিপাশে যে গ্রহ ঘোরে
তার নির্মাণ কি ভাবে হয়েছে ?
(আ) প্রাণীর যে কোন দুইট বৈশিষ্ট্য লেখো ?

৩. নীচের শব্দকার্ডের মধ্য দিয়ে যে কোন পাঁচটি
গ্রহের নাম খোঁজো এবং লেখো।

র	বি	ল	ঙ্গ	ম
বু	ন	টো	হু	রা
সূ	ধ	চু	প্লু	ন্দ্র
শু	ক্র	র্য	প	চ
যু	রে	ন	স	নে

৪. নীচের ঘটনা কাল ক্রমানুসারে লেখো।

- (অ) পৃথিবীতে জলাশয়ের নির্মাণ হয়েছে।
(আ) সূর্য এবং সূর্যের চারি পাশে ঘোরে এই
ধরনের গ্রহের নির্মাণ হয়েছে।
(ই) অনেক প্রকারের এককোশী সজীবের
সৃষ্টি হয়েছে।
(ঈ) অন্তরিক্ষে গরম হাওয়া এবং ধূলি কনয়
মিশ্রিত একটি বড় এবং বিশাল চক্রপাতি
বাদলের নির্মাণ হয়েছে।

কার্য

বিবিধ আকারের গোলের (বলের) সাহায্য নিয়ে
সৌরমণ্ডলের প্রতিকৃতি তৈরী করো।

উপক্রম

তোমার পরিবেশের যে কোন একটি প্রাণী
সংগ্রহালয়ে যাও অথবা নিজের পরিবেশের আশেপাশে
যে প্রাণী তুমি দেখো তার একটি সূচি তৈরী করো এবং
ভিন্ন-ভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধে লেখো।

তুমি জানো কি ?

পৃথিবী গ্রহ ছাড়া ও মঙ্গল গ্রহে সজীবের সৃষ্টি আছে এটা বৈজ্ঞানিকগণ মানতে বাধ্য হয়েছে। এইরূপ সত্য হলে ও এই
বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সামনে আসে নাই। পৃথিবীতে যেমন জল, পর্বত, মরুভূমি, সজীব আছে তেমনি মঙ্গল
গ্রহেও সজীব আছে। এটা জানা গিয়েছে। এখানে কর্ব- দ্বিপ্রাণী বায়ু মাত্রা ৯৫% পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গল গ্রহেতে খুব মাত্রায়
প্রাণবায়ু, জল এবং অন্য কিছু বায়ুর মাত্রা পাওয়া গিয়েছে। অতএব এটা মনে করা যায় যে এখানে সজীবের সৃষ্টি হতে পারে।
এখানকার মাটিতে বনস্পতি বৃদ্ধি হতে পারে। এ ধরনের ঘটক মাটিতে পাওয়া গিয়েছে। জল, বায়ু, পাহাড়, পর্বত সজীবের
বিচার করে বৈজ্ঞানিকরা এখানে বিভিন্ন ধরনের খোঁজ করাও শুরু করেছে। সজীব সৃষ্টি বাচিয়ে রাখার জন্য দ্রবরূপ জলের
দরকার হয়। যে হেতু মঙ্গল গ্রহের আশে - পাশে ধ্রুবীয় প্রদেশ হিমাচ্ছাদিত রয়েছে তথাপি এখানে দ্রবরূপ জল বেশী মাত্রায়
পাওয়া যায় না।

সাহিত্য এবং চলচিত্রের মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহের মানুষ অনেক লোকপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত। বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান
উচ্চ সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাই।

এটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে ভারত ৫ নভেম্বর ২০১৩ তে অন্তরিক্ষে মঙ্গলযান ছেড়ে ছিলো। এই অভিযান
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ যাত্রা সফল হয়েছে। এটা ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।



৪. বিবর্তন

৪.১ বিবর্তনের সংকল্পনা

৪.২ প্রাণী জীবনের বিবর্তনক্রম

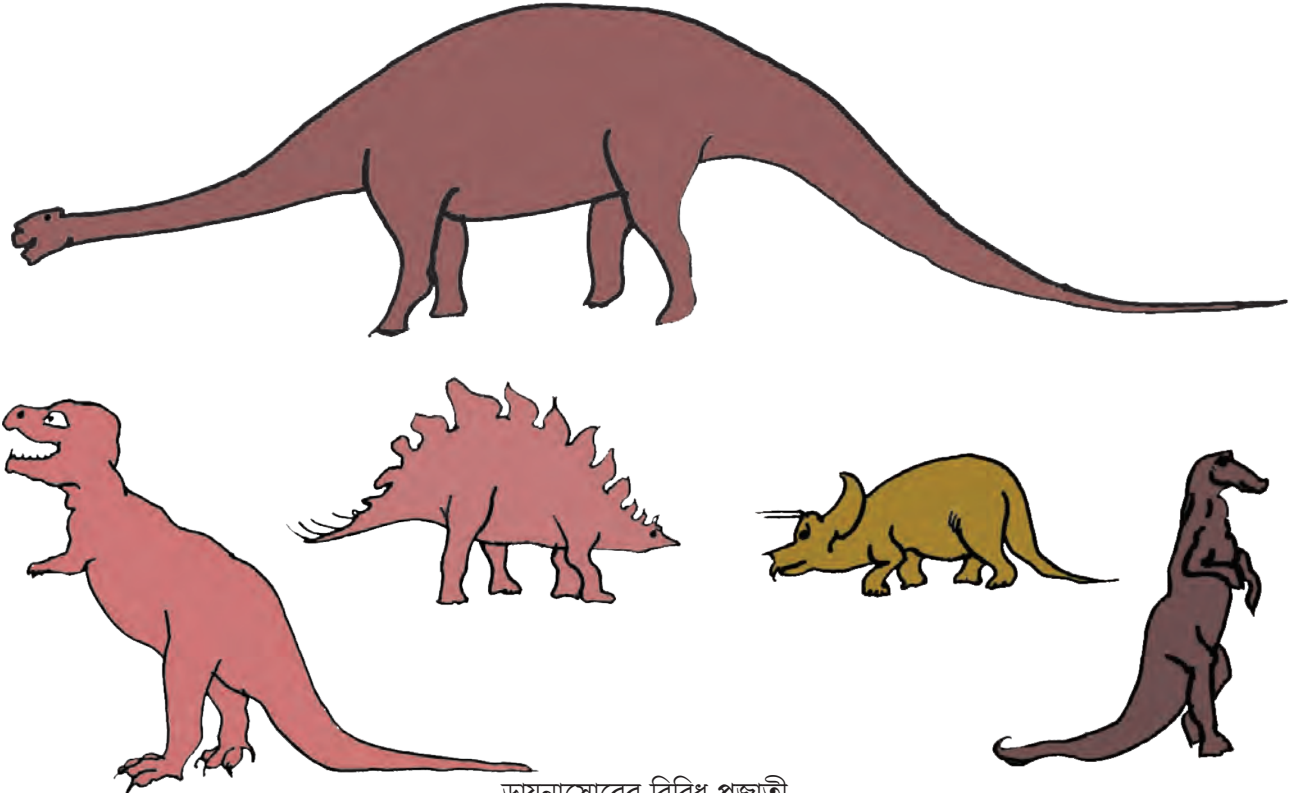
৪.৩ মানবসদৃশ্য বানর

৪.১ বিবর্তনের সংকল্পনা

(বিবর্তন শব্দের অর্থ সাধারণতঃ আমরা বুঝতে পারি যে যার বিবর্তন অখন্ডরূপে ধীরে-ধীরে পরিবর্তন হয়। সজীব জীবনের বৃদ্ধির সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা আছে - ভুল ধারণার পুষ্টি এইভাবে বুঝিয়ে নিতে হবে। ভূপৃষ্ঠে যত সজীব প্রাণী আছে তারা নিজ-নিজ জীবন জীবিকা করার বৈশিষ্ট্য তাদের জন্মজাত গুণ। তাদের জীবনকাল বৃদ্ধির প্রকৃতির সমতল গুণ। সমস্ত সজীব প্রাণী তাদের শরীর রচনা বিবর্তনক্রম, ভোজন সবকিছু প্রাকৃতির সঙ্গে মিল রয়েছে। আলাদা-আলাদা জলবায়ুর স্থানে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক স্থান অনুসারে সমস্ত সজীব প্রাণীর জীবনবিকাসক্রম ভিন্ন-ভিন্ন দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে-সাথে নিজের শরীর রচনা বানিয়ে রাখার জন্য কোন এক বিশিষ্ট প্রাণী। বর্গের শরীর রচনা আন্তরিক পরিবর্তন

হতে দেখা গিয়াছে। কালানুসারে সজীবের পরিবর্তন বংশানুক্রমে রূপান্তর হলো। এইভাবে ভিন্ন-ভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। প্রথম বংশীয় প্রজাতির প্রাণী অপেক্ষা পরে বিকসিত বংশীয় প্রজাতির প্রাণী অধিক বিবর্তন ছিলো। যার কারণে প্রথম বংশীয় প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অনেক কারণে এও দেখা যায় যে প্রথম বংশীয় প্রজাতির প্রাণী আজও প্রাকৃতিক সমতল গুণ বানিয়ে রেখেছে এবং কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিবর্তন এই ভুল ধারণা ‘চার্লস ডার্বিন’ নামক বৈজ্ঞানিকে প্রথমবার সিদ্ধ করেছিলেন।

প্রাকৃতিক সন্তুলন পরিবর্তনের সাথে-সাথে যে প্রজাতির বানিয়ে নিজে করে বাচিয়ে রেখেছে তার বংশানুক্রম আজও স্থানিক পরিবেশে দেখা যায়। যে প্রজাতির প্রাণী প্রাকৃতিক সন্তুলন পরিবর্তনে নিজে করে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি - তার বংশানুক্রম প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন কালে ডাইনোসর প্রজাতির নামে এক বিশালকায় প্রাণী জীবিত ছিলো। বলা হয় বা শোনা যায় যে কিছু সময়ের মধ্যে এই প্রজাতির প্রাণী নষ্ট হয়ে গিয়েছে।



ডায়নাসোরের বিবিধ প্রজাতি

এই বিষয়ে এ ধারণা করা হয় যে হঠাৎ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে অথবা ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে বিশাল আকারের প্রাণী ডাইনোসর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাখা আছে এমন এক প্রকারের ডাইনোসরের অবশেষ এখনও পাওয়া যায়। এ ধরনেরও দেখা যায় যে দুই পায়ে চলে এবং পাখায়ুক্ত ডাইনোসরের কিছু সম প্রজাতির বিকাশ হয়েছে এবং এই ধরনের প্রজাতি থেকে কিছু পাখির সৃষ্টি হয়েছে।



ডাইনোসরের অস্থিপাঞ্জর



পাখায়ুক্ত ডাইনোসরের কাল্পনিক চিত্র

৪.২ প্রাণী জীবনের বিবর্তনেরক্রম

পৃথিবীতে সজীব প্রাণীর সৃষ্টি বা আরম্ভ এককোশীয় আদিজীব থেকে শুরু হয়েছে। ইহা আমরা পিছনের পাঠে অধ্যয়ন করেছি। এও দেখা যায় যে আদিজীব থেকে বহুকোশীয় সজীব প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। বহুকোশীয় সজীব প্রাণীর ধীরে-ধীরে বিবর্তন হয়। ইহার মাধ্যমে জলীয় বনস্পতি ও বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাণী জীবনের বিবর্তনেরক্রম নিম্ন প্রকার-

১. **অমেরুদণ্ডীয় সজীব প্রাণী :** যে সজীব প্রাণীর শরীরে মেরুদণ্ডীয় হাড় থাকে না তাকে অমেরুদণ্ডীয় সজীব প্রাণী বলে।
যেমন-শামুক



২. **মেরুদণ্ডীয় প্রাণী :** যে প্রাণীর শরীরে মেরুদণ্ডীয় হাড় থাকে তাকে মেরুদণ্ডীয় প্রাণী বলে।
যেমন - জলচর - মাছ



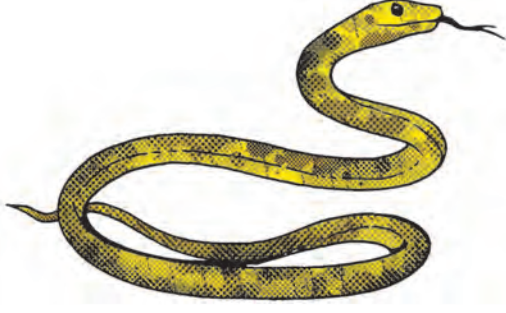
৩. **উভচর :** যে প্রাণী জলে ও ভূমিতে বিচরণ করে তাকে উভচর প্রাণী বলে।



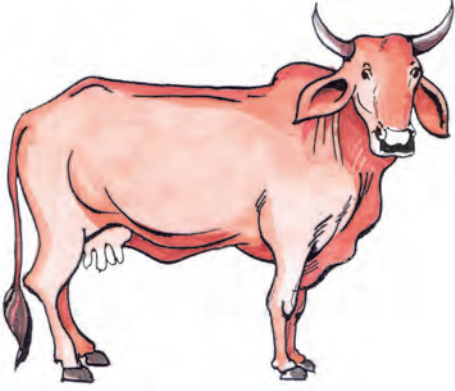
- পাখির সমূহ -



- সরীসৃপ প্রাণী : যেমন-সাপ



- স্তনধারী প্রাণী : যেমন-গাভী



স্তনধারী প্রাণী: মেরুদণ্ডীয় প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিক বিবর্তন স্তর অর্থাৎ স্তনধারী প্রাণী। গর্ভে শিশুর পূর্ণ বৃদ্ধি হওয়ার পর মা তাকে জন্ম দেয়। জন্মের পর কিছু দিন মায়ের দুধে তাহার পুষ্টি হয়। ইহা হয়তো স্তনধারী প্রাণীর গুণ বৈশিষ্ট্য।

প্লাটিপাস এক ধরনের স্তনধারী প্রাণী এবং পিপিলিকা খাওয়া এক ধরনের প্রাণী (এন্টইটর)



প্লাটিপাস

এর প্রজাতির মধ্যে স্তনধারী প্রাণী পাওয়া যায় কিন্তু স্তনধারী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও এই প্রাণী ডিম দেয়।



পিপিলিকা খাওয়া প্রাণী

৪.৩ মানবসদৃশ্য বানর

মানবের মত দেখতে যে ধরনের বানর তাকে মানবসদৃশ্য বানর বলে। অন্য ভাষায় ‘এপ বানর’ বলে। মানবসদৃশ্য বানরের প্রজাতির নিবাস সাধারণতঃ গাছে। যে প্রজাতির বানর গাছে থাকে তার পরিবর্তনের কোন কারণ নেই। এদের আদি বানর যেরূপ ছিল তেমনিই আছে কিন্তু অন্য প্রজাতির বানর ঘাস প্রদেশে গাছের বদলে জমি, ভূমিতে থাকতে শুরু করেছিল। যে প্রজাতির বানর ঘাস, জমি ও ভূমিতে থাকতে লাগল তাদের উন্নতি খুব তাড়াতাড়ি হতে লাগল। সময়ের সাথে-সাথে আদি বানরের বিকসিত ক্রমশঃ মানব প্রজাতি রূপে বিকসিত হলো। এই ধরনের ঘটনা সর্ব প্রথম অফ্রিকা মহাদ্বীপে হয়েছিল। এই বিকসিত মানবকে আমরা ‘আদিমানব’ বলি। আদি কথার অর্থ পূর্বে বা প্রথমে আরম্ভ। আগামি পাঠে আমরা মানবের বিকাশ পর্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করবো।

১. বন্ধনী থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- (অ) বিবর্তনের ধারণা সর্ব প্রথম ----- নামক বৈজ্ঞানিক খোঁজ করেছিলেন।
(চার্লস ডার্বিন, বিলার্ড লীবি, লুই লীকী)
(আ) মেরুদণ্ডীয় প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিক বিবর্তন অর্থাৎ ----- প্রাণী।
(জলচর, উভয়চর, স্তন্যধারী)

২. প্রত্যেক প্রশ্নের এক বাক্যে উত্তর দাও।

- (অ) জলে ও ভূমিতে বিচরণ করে এ ধরনের সজীব প্রাণীকে কি বলে?

(আ) আদি মানবের প্রজাতি সর্ব প্রথম কোথায় পাওয়া গিয়েছে?

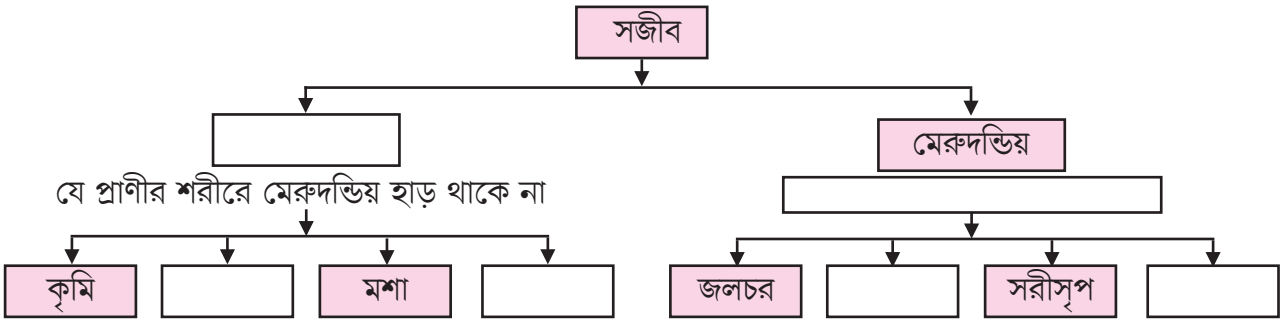
৩. নিম্নলিখিত বাক্যের জন্য কারণ লেখো।

- (অ) ডাইনোসর যেমন বিশাল প্রজাতির প্রাণী নষ্ট হয়েছে।
(আ) আদি প্রজাতির তুলনায় অন্য এক নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হলো।

৪. নীচের সংকল্পনা চিত্র দেখো এবং শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

কার্য্য : ডাইনোসরের একটি ছবি আঁকো।

প্রাণীর বিবর্তন



উপক্রম

মেরুদণ্ডীয় প্রাণী এবং অমেরুদণ্ডীয় প্রাণীর ছবি একত্রিত করো। ছবিগুলি কেটে খাতায় লাগাও এবং তাদের বৈশিষ্ট্য লেখো।

তুমি জান কি ?



চার্ল ডার্বিন

জন্ম-১৮০৯ মৃত্যু-১৮৮২

মহান শাস্ত্রজ্ঞ চার্লস ডার্বিন ১৮৫৯ খ্রী. তার “অন-দা-আমেরিকান আফ স্পিশিজ” (প্রাণীর প্রজাতির উদ্গম এই বিষয়ে) এই গ্রন্থে বিবর্তনের সংকল্পনা রেখেছিলেন। ডার্বিনের পূর্বেই কার্ল লিনস নামক শাস্ত্রজ্ঞ প্রাণী জাতির শাস্ত্রীয় বর্গীকরণ করার পদ্ধতি শুরু করেছিলেন। শরীর রচনার আধারে বানরের কিছু প্রজাতির এবং মানবের কিছু সম্বন্ধ থাকতে পারে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ডার্বিন তার প্রথম গ্রন্থে বিবর্তনের প্রক্রিয়া বানর ও মানবের বাস্তবে কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, এ বিষয়ে সঠিক মত ব্যক্ত করেন। ১৮৭১ খ্রী. তার চার্ল ডার্বিন দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তার নাম ছিল ‘দা-ডিসেন্ট অফ ম্যান’ (মানবের আবরণ) এই গ্রন্থে তিনি মানুষের লেজ না থাকলেও তার মেরুদণ্ডের শেষের হাড়টাই যে লেজের অবশিষ্ট ভাগ, এ বিষয়ে সকলের লক্ষ্য আকর্ষিত করেছিলেন।

৫. মানবের উন্নতি

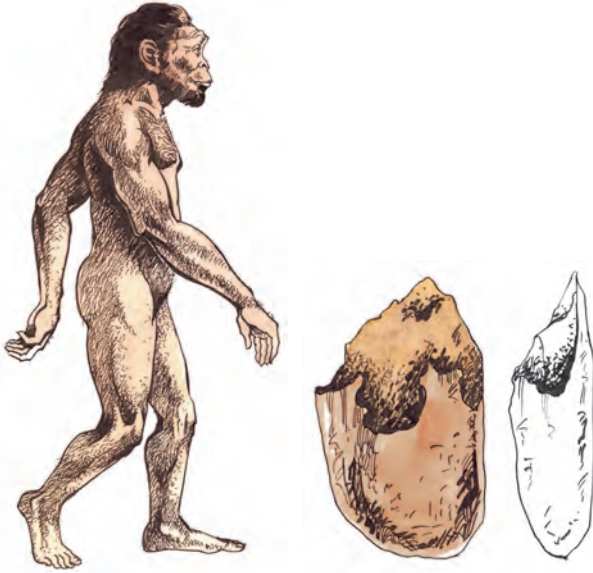
৫.১ আদি মানব থেকে আধুনিক মানব

৫.২ বুদ্ধিমান মানব এবং সংস্কৃতি

পিছনের পাঠে আমরা অভ্যাস করেছি যে, এপ নামক বানর থেকে বিবর্তন হয়ে আদি মানবের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তী ক্রমে আদি মানব নিজের হাতের ব্যবহার করে পাথর, কাঠ ও প্রাণীর হাড় দিয়ে ছোট-ছোট অস্ত্র তৈরী করেছিলো।

৫.১ আদি মানব থেকে আধুনিক মানব

আদি মানব: প্রাচীন কাল থেকে আদি মানবের কথা আমরা শুনেছি বা জেনেছি। আদি মানব কথার অর্থ বোঝা যায় যে, যে মানব নিজের হাত কে কুশলতা পূর্বক কাজে ব্যবহার করতে পারত। এই ধরনের মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ সর্বপ্রথম আফ্রিকা মহাদ্বীপে তঞ্জানিয়া এবং কেনিয়া দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এই মানবের খোঁজ লুই লীকি



বুদ্ধিমান মানবের
কাল্পনিক চিত্র

বুদ্ধিমান মানবের দ্বারা
নির্মিত অস্ত্র

নামক বৈজ্ঞানিক করেছিল। এই ধরনের মানবের অবশেষের সঙ্গে তৎকালীন সময়ের হাতিয়ার ও সাহিত্য পাওয়া গিয়েছিলো। এইজন্য এই ধরনের নাম হোমো হেবিলিস নাম দিয়েছিলো। লেটিন ভাষায় হোমো শব্দকে মানব বলে। হেবিলিস এর

অর্থ কুশলতা পূর্বক হাত ব্যবহারকারী। কুশল মানব দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারতো কিন্তু তার মেরুদণ্ডি হাড় সিধা ছিলো না। মেরুদণ্ডি হাড় বক্রাকারের মত ছিলো। এই ধরনের মানবের মাথা এপ বানরের মাথার অপেক্ষা খুবই বড় ছিলো। কিন্তু তাদের শরীরের রচনা, চেহারা আর হাত পায়ের রচনা এপ নামক বানরের মত ছিলো।

আদি মানবের দ্বারা তৈরী অস্ত্র দিয়ে বড় ধরনের প্রাণীকে শিকার করা সম্ভব হতো না। মাংস কাটা, হাড়ের ভিতরের মজ্জা বের করা, হাড়কে টুকরো-টুকরো করা, ইত্যাদি কাজের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা হতো। সেজন্য এরূপ অনুমান করা যায় যে, তারা অন্য প্রাণীর দ্বারা শিকার করা অবশিষ্ট মাংস খেতো। ছোট-ছোট প্রাণীর শিকার ও করতো। এছাড়াও পাখি, পাখির ডিম, ফল ও কন্দমূল ইত্যাদি একত্রিত করতো ও খেয়ে দৈনিক জীবন যাপন করতো।

সিধা মেরুদণ্ডি মানব : সিধা মেরুদণ্ডি মানব ইহা বিবর্তনক্রমে একটি মহত্বপূর্ণ ধাপ বা সিড়ি। ধীরে - ধীরে কালের সঙ্গে - সঙ্গে মানবের বিকাশ শুরু হয়েছিলো। বাঁকা মেরুদণ্ড থেকে সিধা (নক্ষনদণ্ড) মেরুদণ্ড হতে লাগলো, এক প্রকারে তাদের ইরেক্টাস মানব নামে পরিচিত হ'তে লাগলো। ইরেক্টাস কথার অর্থ-সিধা বা খাড়া। আগে গিয়ে এই মানবের নাম হোমো ইরেক্টাস নাম দেওয়া হয়েছিলো। আদি বা কুশল মানবের অপেক্ষা হোমো ইরেক্টাস মানব সমূহ ক'রে বসবাস করতো।

এই জাতীয় মানবের আগুন কি তাহা ভালভাবে পরিচিত ছিলো। জঙ্গলে আগুন লাগা দেখলে ভয় পেত না। কখনো-কখনো জঙ্গলে গাছের ডালে আগুন জ্বলতে থাকতো। সেই আগুন এনে অন্য যায়গায় আগুন লাগাতো বা অন্য কাজে ব্যবহার করতো।

এই মানব জাতির কালখন্ডের সময় পৃথিবীর অধিকতম ভাগ হিমময় ছিলো। এর অর্থ এই যে হিমময় থাকার কারণে পৃথিবীর জলবায়ু অধিক সময় খুব শীতময় থাকতো। শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জঙ্গলে বা নিজের গুহার নিবাস স্থানের আশে - পাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। তথাপি হোমো ইরেক্ট ধরনের মানব জাতি আগুন উৎপন্ন কি করে হয় এটা পরিকল্পনা করতে পারে নাই। আগুন দিয়ে আগুনের ব্যবহার করতে পারতো কিন্তু নিজে আগুন জ্বালাতে পারতো না।

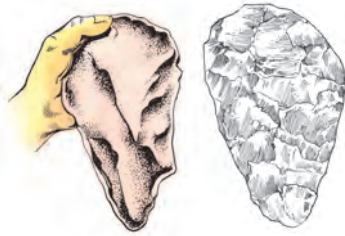
হোমো ইরেক্ট মানবদের তৈরী করা যে অস্ত্র কুশল মানবদের অপেক্ষা উন্নত ও সুন্দর আকার বদ্ধতা ছিলো। তারা হাত কুড়ালের মত অস্ত্র বানাতে। আফ্রিকা এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদ্বীপে



শক্তিমান মানব



সিধা মেরুদণ্ডীয় মানবের কাল্পনিক চিত্র



সিধা মেরুদণ্ডীয় মানবের দ্বারা নির্মিত পাথরের অস্ত্র

এই ধরনের মানব জাতির অবসেস এবং এদের ব্যবহার করা অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে।

শক্তিমান মানব: মানব জাতির বিবর্তনক্রম ছিলো শক্তিমান মানব। এদের শরীর রচনা খুবই বলিষ্ঠ ও বলবান। এই ধরনের মানুষের অবশেষ জার্মান দেশের নিয়োডরথল নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছে। যার জন্য এই মানব জাতির নাম নিয়োডরথল মানুষ বলে। এই ধরনের মানুষের মাথা হোমো ইরেক্টস

মানবের মাথার অপেক্ষা অনেক বিকসিত ছিলো।

শক্তিমান মানব বিশেষকরে পাহাড়ের গুহায় বসবাস করতো। ছোট-ছোট পাথরের টুকরা দিয়ে খুব ধারালো প্রকারের পাথর দিয়ে ছোট-ছোট অস্ত্র বানান তাদের একটি কৌশল ছিলো। ছোট-ছোট অস্ত্র বড়-বড় কাঠের কাঠির মাথায় বা লম্বা ধরনের হাড়ের মাথায় বাঁধতো। বেঁধে তা দিয়ে ভাল-কুড়াল যেমন অস্ত্র তৈরী করতো। এই ধরনের অস্ত্র দিয়ে তারা বড়-বড় প্রাণীর শিকার করতো। মৃত প্রাণীর শরীর থেকে হাড় বা মাংস কাটার জন্য খুব পাতলা ধার যুক্ত পাথরের ব্যবহার করতো। মৃত প্রাণীর চামড়া থেকে মাংস আলাদা করার জন্য পাতলা ধার ধরনের পাথর দিয়ে চাকু তৈরী করে চামড়া থেকে মাংস আলাদা করতো। চামড়া রৌদ্রে শুকিয়ে তা শরীরের বস্ত্ররূপে ব্যবহার করতো। শক্তিমান মানব মাংসাহারী ছিলো। আগুনে পুড়িয়ে বা গরম করে ভোজন করতো। পাথর-পাথর দিয়ে আগুন তৈরী হয়, পাথর-পাথর দিয়ে ঘসলে আগুনের চিনগারী তৈরী হয় এ সম্বন্ধে তাদের জানা ছিলো।

শক্তিমান মানব কিছু কলাগুণ বা কলা কৌশল এই কালখন্ডে বিকসিত করেছিলো। কিছু বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে এই কালখন্ডে শক্তিমান মানব নিজেদের মধ্যে এক প্রকারের আওয়াজ ব্যবহার করতো ভাষারূপ বলতো। ইশারা করে মনের ইচ্ছা একে অপরকে বলার চেষ্টা করতো। তাদের বলার বা ইশারা দ্বারা বিকসিত ভাষা ঐ সময়ে বা কালখন্ডে ছিলো কি না এটা ঠিক বলতে পারা যায় না।

এই মানব জাতি সমূহে-সমূহে বসবাস করতো। সমূহের যে-কোন ব্যক্তি যদি মারা যেত তাহলে তাকে মাটিতে পুতে রাখতো। মাটিতে রাখার সময়ে মৃত দেহের সাথে যে অস্ত্র ব্যবহার করতো সেই সব অস্ত্র প্রাণীর শীং মাটিতে পুতে দিতো। মাটিতে পুতে রাখার পূর্বে মৃতদেহের সর্ব শরীরে লাল রংয়ের মাটি লাগতো। এই ধরনের কার্য প্রনালী দ্বারা বোঝা যায় যে শক্তিমান মানবের কালখন্ডের সময়েও কিছু সামাজিক নিয়ম বদ্ধতা তাদের মধ্যে ছিলো।

সময়ের সাথে-সাথে শক্তিমান মানবের কিছু সমূহ আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বেড়িয়ে ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদ্বীপে এসে বসবাস করতে লাগলো। বাস্তবিক রূপে এক জলবায়ু থেকে অন্য প্রাকৃতিক জলবায়ুতে এসে বসবাস করতে অনেক অসুবিধা হয়েছিলো। অন্য প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিলো। শক্তিমান মানব জাতির জীবন মান, আবশ্যিক সাহিত্য, অস্ত্র এবং জীবন যাপন করার উন্নত পদ্ধতির জন্য হাজার বছর লেগে গিয়েছিলো।

ধীরে-ধীরে এই কালখন্ডের বিকাশ অগ্রসিত হতে লাগলো। শক্তিমান মানব প্রগতির দিকে এগিয়ে চললো। মানবের মধ্যে নিজের ভাবনা, শারীরিক রচনা, ভোজন, বসবাস ব্যবস্থা, জীবন যাপনের স্তর সব কিছু পরিবর্তন হতে লাগলো। বিকাশ শীলের বিচার করে শক্তিমান মানব আগে গিয়ে বুদ্ধিমান মানব নামে পরিচিত হলো। শক্তিমান মানব আর বুদ্ধিমান মানব কিছু সময় ইউরোপ দেশে মিলেমিশে বসবাস করতে লাগলো। সময়ের সঙ্গে চলতে-চলতে বুদ্ধিমান মানবের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রাকৃতিক জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করতে না পারাও অনান্য কারণে ধীরে-ধীরে শক্তিমান মানবের

বংশজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। কম করে ৩০,০০০ হাজার বছর পূর্বে শক্তিমানব মানব নষ্ট হয়েছে এইরূপ কর্ব-১৪ এর ধারণা।

বুদ্ধিমান মানব: আদি বা কুশল মানব, শক্তিমান মানব এদের থেকে বুদ্ধিমান মানবের বিচার শক্তি খুব বেশী যাহার কারণে এই মানবকে বুদ্ধিমান মানব বলা হয়। বুদ্ধিমান মানবকে হোমোসেপিয়ন বলা হয়। সেপিয়ান কথার অর্থ বুদ্ধিমান। এই বুদ্ধিমান মানবকে ইউরোপ খন্ডে ক্রোম্যানান মানব বলে পরিচিত ছিলো। বুদ্ধিমান মানবের অবশেষ আফ্রিকা, এশিয়া আর ইউরোপ মহাদ্বীপে পাওয়া যায়। ক্রোম্যানান মানব নিজের কাজ করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করতো। এই অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করার জন্য ধারালো পাথরের ব্যবহার করতো। ধারালো পাথর কোন এক লাঠির বা লম্বা ধরনের হাড়ের খাঁচার মধ্যে রেখে ভালো তৈরী করতো। ইহার দ্বারা প্রাণী শিকার করতো।



বুদ্ধিমান মানব

বুদ্ধিমান মানবের প্রগতি খুব শীঘ্রই হয়েছিলো।
বুদ্ধিমান মানবের কণ্ঠ স্বর পূর্ণরূপে বিকাশ
হয়েছিলো। কণ্ঠ থেকে স্বরের উচ্চারণ যে কোন
একটি ভাষায় সংকেত। ভাষার উচ্চারণের জন্য
কণ্ঠস্বরের ব্যবহার করতে লাগলো। শারীরিক হালচাল
আর কণ্ঠস্বরের আওয়াজ করতে হলে মুখের মধ্যের
জীভের হালচাল করতে হবে এটা বুঝতে পারলো।
এবং জীভের হালচাল করতে শুরু করলো।
জীভের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ
করতে শিখতে লাগলো। চোখ দিয়ে দেখা এবং
নিজের মনের কল্পনা শক্তি দিয়ে বাক্য বা শব্দের
উচ্চারণ করতে শুরু করলো। নিজের প্রয়োজন
অনুসারে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করার কল্পনা শক্তির
দ্বারা বস্তুর বর্ণনা এবং বস্তু তৈরী করতে লাগলো।
বিভিন্ন ধরনের কলাত্মক বস্তু তৈরী করতে লাগলো।
কল্পনা শক্তি, বিচার, বুদ্ধি নিরীক্ষণের জন্য এদের
‘বুদ্ধিমান মানব’ অথবা ‘কল্পনাশক্তির মানব’ নাম
রাখা হলো।



গুফা চিত্র

**৫.২ উন্নত বুদ্ধিমান মানব এবং সংস্কৃতির
অগ্রগতি বুদ্ধিমান মানব:** বুদ্ধিমান মানবের বিচার,
কল্পনা করার শক্তি অন্য মানবের অপেক্ষা খুব বেশী
উন্নত। যার কারণে তারা উন্নত বুদ্ধিমান মানব নামে
পরিচিত হয়েছিলো। উন্নত বুদ্ধিমান মানবদের
‘হোমো সেপিয়ান’ মানব বলে। এদের মস্তিষ্ক বৃদ্ধির
সঙ্গে-সঙ্গে আকলন-ক্ষমতার বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি
হয়েছিলো।

উন্নত বুদ্ধিমান মানব কথার অর্থ এই যে যুগের
বা বর্তমান কালখন্ডের মানব। আধুনিক মানব কে
উন্নত বুদ্ধিমান মানব বলা হয়। বর্তমান মানবের
রঙ, রূপ, স্বাস্থ্য বিষয়ী সমস্ত কিছু পূর্বজদের সঙ্গে
মিল হয়। যাদের পূর্বজদের সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন ঘটকের
মিল দেখা যায়। তাকে আনুবংশিক বলা হয়।
আনুবংশিক বংশক্রমের অভ্যাস যে বিজ্ঞান
শাস্ত্র করে তাকে উৎপত্তি বিজ্ঞান বলে। এই উৎপত্তি
বিজ্ঞান শাস্ত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান করার পর
আধুনিক মানবের মধ্যে শক্তিমান মানবের অর্জিত
গুণ পাওয়া গিয়েছে।

এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে এটা পাওয়া গিয়াছে
যে শক্তিমান মানব এবং বুদ্ধিমান মানব এরা পূর্বের
বংশজ ইসা পূর্বের ১১০০০ থেকে ইসাপূর্ব
১০,০০০ এর মধ্যে আধুনিক মানব পশুপালন বা
চাষ-বাস করতো। ধীরে-ধীরে তাদের বিচার এবং
কল্পনা শক্তির জন্য পশুপালন বা নতুন নতুন চাষ
-বাসের পদ্ধতির অবলম্বন করে উন্নত জীবন যাপন
করতে লাগলো। তাদের দৈনিক জীবনে পরিবর্তন
হতে শুরু হলো। জীবনমান স্থির হতে লাগলো।
জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করতে
শুরু করলো। পশুপালন করতে শুরু করলো।
ভোজনে স্বদিষ্ট অন্ন পদার্থের ব্যবহার করতে
লাগলো। পরিণাম স্বরূপ দৈনিক ভোজনে কার্বনিক
পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধি হতে লাগলো।

জীবনমান এবং খাদ্য পদার্থের ক্রমশঃ
পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধিমান মানবের শরীর রচনা
থেকে উন্নত মানবের শরীর রচনায় বিকসিত হলো।
চেহরার আকার ও পরিবর্তন হতে লাগলো।

আধুনিক মানব- ‘উন্নত বুদ্ধিমান মানব’ এদের
শারীরিক রচনার উপর নির্ভর করে নাম দেওয়া
হয় নাই বরং এদের বৌদ্ধিক বিকাশ, ভাবনাত্মক
বিকাশ, আচার, বিচার ও সংস্কার বিকাশের জন্য
‘উন্নত বুদ্ধিমান মানব’ নাম দেওয়া হয়েছে।

মানুষের অন্ন গ্রহণ করা প্রত্যেকটা মানবের
মূলভূত অধিকার থাকা সত্ত্বেও আধুনিক মানব
ইহাতে পরিপূর্ণ ছিলো না।

নিজের কল্পনা শক্তির বিকাশ, ভাবনার বিকাশ, কৌশল আর হাতের কলা গুণের উপর নির্ভর করে নিজের জীবনমান বৃদ্ধি করে নিজের সংস্কৃতির উদয় করেছে এবং নতুন সমাজের বিকাশ করেছে। পশুপালন এবং কৃষি কার্যের বিকাশের সাথে-সাথে। নব-নতুন কৃষিতন্ত্রের ব্যবহার করে উন্নতি করেছে।

মানবরূপে বানর জীবনক্রম থেকে মানবের উন্নতি জীবনক্রম পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় আমরা অভ্যাস করেছি। আদি মানব থেকে উন্নত মানবের জীবন যাপনের সমস্ত ঘটনাক্রম আমরা পাঠের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এখন এর পরের পাঠে মানবীয় সংস্কৃতির অভ্যাস করবো।

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

- অ) লেটিন ভাষায় ----- শব্দকে মানব।
আ) শক্তিমান মানব বিশেষকরে পহাড়ের ----- বসবাস করতো।

২) প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো।

- অ) ভালো কুড়াল কাহারো তৈরী করেছিলো?
আ) অনুবংশীকতা কাহাকে বলে?

৩) নিম্নলিখিত বাক্যের জন্য কারণ লেখো।

- অ) শক্তিমান মানবের অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়েছে।
আ) বুদ্ধিমান মানব প্রয়োজন অনুসারে আওয়াজ করতে পারতো।

৪) নিম্নলিখিত শব্দ কোড তৈরী করে লেখো।

১							২		
		৩				৪			৫
					৬				
		৭					৮		
		৯					১০		

আড়া ভাবে:

- ১) সিধা মেরুদন্ডিয় মানব XX XXXX।
- ২) সিধা মেরুদন্ডিয় মানবকে XX নির্মাণ করার তকনিক জানা ছিলো না।
- ৩) শক্তিমান মানবের অবশেষ সর্বপ্রথম XXX দেশে পাওয়া গিয়েছে।
- ৭) বুদ্ধিমান মানব নিরিক্ষণ এবং কল্পনা শক্তিদ্বারা XX তৈরী করতে লাগলো।
- ৯) XXXX এর অর্থ বুদ্ধিমান।
- ১০) শক্তিমান মানব নিজেদের অস্ত্র XXX দ্বারা তৈরী করেছিলো।

খাড়া ভাবে:

- ১) কুশালমানব XX XXXX।
- ৪) কুশল মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ XXX এই দেশে পাওয়া যায়।
- ৫) সিধা মেরুদন্ডিয় মানব XXXXX এক সমান অস্ত্র তৈরী করতো।
- ৬) ইউরোপে বুদ্ধিমান মানব XXXX নামে জানা যেত।
- ৮) শক্তিমান মানব জুজুব আওয়াজ দ্বারা XXX করতো।

কৃতি : কুশল মানব থেকে উন্নতশীল বুদ্ধিমান মানব পর্যন্ত বিবিধ চরনের বর্ণনার তুলনাত্মক সারণী তৈরী করো।

তোমরা কি ইহা জানো ?

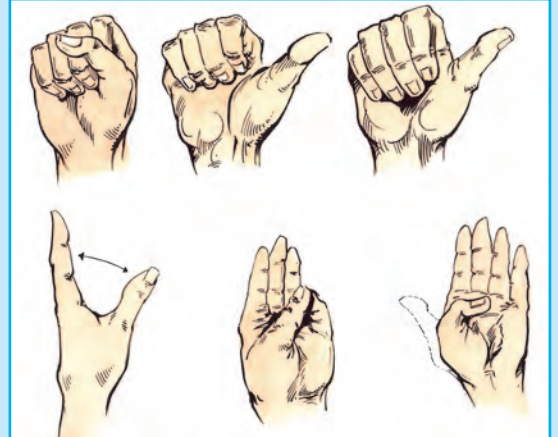
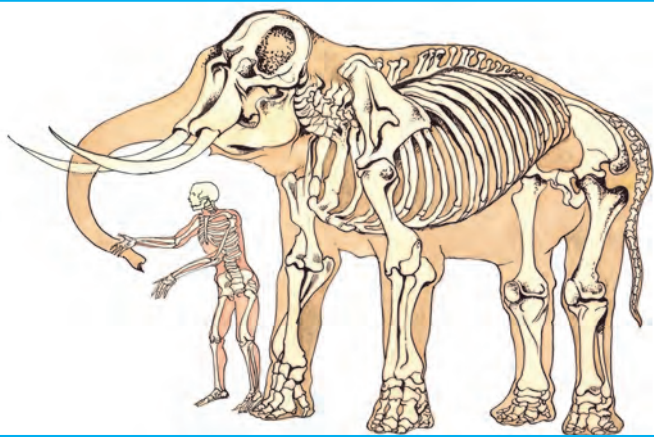
মানবীয় বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্য আমরা ইতিহাসের অভ্যাসের মাধ্যমে পাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবীয় হাড়ের অস্তিত্ব মানবীয় অবশেষ থেকে জানতে পারি। পাথর কথার অর্থ পাথর। মৃত প্রাণীর শরীর নষ্ট হয়ে হাড় মাটির নিচে অথবা জমিতে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। উপরে ছড়িয়ে যাওয়া মৃত প্রাণীর হাড় ধিরে-ধিরে মাটির নিচে ডেবে যায়। অনেক বছর মাটির নিচে ডেবে থাকার কারণে হাড়ের মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র পড়ে যায়, সেই ছিদ্রের মধ্যে খনিজ যুক্ত মাটি জমে যায়। হাড় সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হওয়ার পর হাড়ের মধ্যে খনিজ পদার্থ শুধু অবশেষেই থেকে যায়। এই ধরনের হাড়ের অবশেষকে প্রাণী অশ্মিভূত অবশেষ বলে।

এই ধরনের প্রাণী অবশেষ আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। মানবের বিকাশ ক্রমের এই ধরনের অবশেষের তথ্য ভিন্ন-ভিন্ন অবশেষের মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া যায় কিন্তু এর জন্য আবশ্যিক সমস্ত বিধি বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট রূপে আজ ও পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত অবশেষের মাধ্যমে ইহা ও দেখা গিয়েছে যে মানবের বিবর্ধন আদিমানব প্রজাতি থেকে নতুন মানব প্রজাতির উৎপত্তি-এই ধরনের এক রেখীয় ক্রম পদ্ধতিতে হয় নাই। যে কোন প্রজাতির বিকাশ হওয়ার সময় হয়ত তার অনেক শাখা-প্রশাখায় নির্মাণ হতে পারে। তা থেকে হয়তো কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এই ধরনের প্রাণী প্রজাতির ভিন্ন-ভিন্ন শাখায় বিবর্তন ক্রম একে অপরের সঙ্গে নিশ্চিত ভাবে জড়িত ছিলো। ইহা বর্তমান স্থিতিতে বলা সম্ভব নয় কিন্তু মানবীয় সংস্কৃতির প্রগতি ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে কিছু প্রজাতির অবশেষ সম্বন্ধে মহত্বপূর্ণ তথ্য (জানকারি) রাখা একান্ত দরকার মানব দ্বারা নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র আর জীবন উপযোগী বস্তুর মাধ্যমে পুরানো মানবীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের রচনা করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ কুশল মানব → সিধা মেরুদণ্ডীয় মানব → শক্তিমান মানব → বুদ্ধিমান মানব এই চার প্রজাতির মানব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মানবের শরীরের রচনা বৈশিষ্ট্য: মেরুদণ্ডীয় প্রাণীর মধ্যে মানবের শরীর রচনা অন্যতম। অন্য মেরুদণ্ডীয় প্রাণীর চেয়ে মানব শরীর রচনা ভিন্ন। তাহার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হলো।

১. মানব সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে। যাহার জন্য মানব দুই পায়ে চলতে পারে। অন্য মেরুদণ্ডীয় প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যাহার জন্য তাহারা চার পায়ে চলে।
২. মানব সোজা হয়ে দুই পায়ে চলে। ইহার ফলে চার পা থেকে দুই পায়ের ব্যবহার হাত হিসাবে করে। মানবের হাতের পাঞ্জার রচনা অন্য প্রাণীর সামনের দু পায়ের থেকে ভিন্ন।
৩. মানবের হাতের আঙ্গুল অন্য আঙুলগুলির আগে এনে ঘুড়াতে পারে। যাহার জন্য যে কোন বস্তুকে নিজের ইচ্ছামত শক্ত কিংবা হালকা ভাবে ধরতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যতার জন্য অনেক হস্ত কৌশলের কাজ যাহা অন্য প্রাণীরা করতে পারে না তাহা করতে পারে। মানব জাতিকে বিবিধ, সাহিত্য, ঘাতক অস্ত্র, সরঞ্জাম নির্মাণ করার প্রাণী বলা হয়েছে।
৪. মানবের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অন্য প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে অধিক। অন্য প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী চিন্তা করতে পারে।
৫. মানব চেহেরার রচনা এমন রয়েছে যে নিজের মনের হাবভাব চেহেরার দ্বারা ব্যক্ত করতে পারে।
৬. বিবিধ ধ্বনির উচ্চারণ করার জন্য স্বর যন্ত্রের রচনা, তেমনি মূল্যায়ম জিভ আছে। কিন্তু মানবের এই স্বর যন্ত্রের বিবর্তন করার জন্য হাজারো বৎসর লেগে গেছে।



৬. পাষান যুগ : পাথরের অস্ত্র

৬.১ প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্রের আকার ও প্রকার।

৬.২ পাষান যুগের অস্ত্র-শস্ত্র

৬.১ প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্রের আকার ও প্রকার

মনে করো মাটির ভেতর চক-চক করে এমন কোন বস্তু যদি আমরা দেখি তাহলে বস্তুটি মাটির উপর বের করার জন্য আমরা কি করি? প্রথমত: বস্তুটি আমরা তাড়াতাড়ি হাতের আঙ্গুল দিয়ে বের করার চেষ্টা করবো-হাতের আঙ্গুল দিয়ে না হলে শক্ত কোনো একটা কাঠি বা ধারালো কাঠ দিয়ে বের করার চেষ্টা করি, ইহাতেও যদি না হয় তাহলে যে কোনো একটি ধারালো বস্তু বা লম্বা আকারের পাথরের সাহায্য নেই। ধারযুক্ত পাথরের দ্বারা কাজ হওয়া তো প্রয়োজন কিন্তু যদি না হয় তাহলে একটি লোহার লম্বা সড়কি দিয়ে বের করি। ইহার অর্থ এই যে, প্রয়োজন বোধে কাজের জন্য উচিৎ বা সঠিক সাহিত্যের চয়ন করা প্রয়োজন। সাহিত্যের চয়ন করার জন্য নীচের কথাগুলিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. সাহিত্যের উপলব্ধতা
২. কম সময়ের মধ্যে শক্তির ব্যবহার
৩. বেশি পরিণামকারকতা
৪. উচিৎ সাহিত্যের ব্যবহার করে সঠিক কৌশল

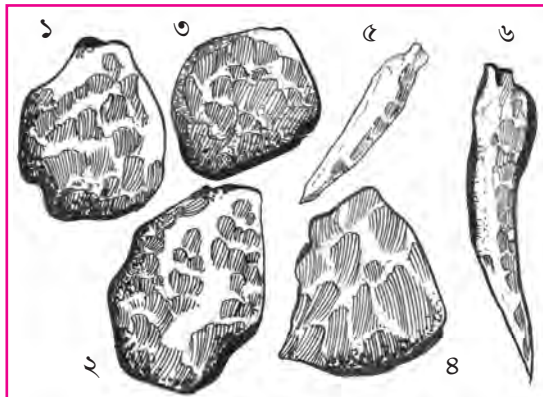
প্রাপ্তি ‘চিম্পাঞ্জী’ নামের বানর বীজ অথবা কঠোর ছালের ফল ভাঙ্গার জন্য পাথরের ব্যবহার করতো। এছাড়াও উইপোকার ডিক থেকে উইপোকা ধরার জন্য লম্বা লাঠির ব্যবহার

করতো। মানুষও মৃত প্রাণীর লম্বা হাড়, ধারাল পাথর, শুকনো কাঠ এবং লম্বা ডালের ব্যবহার করতো।

ধিরে-ধিরে মানবের মনের কল্পনাশক্তির বিকাশ হতে লাগলো। সময়ের সাথে-সাথে প্রগতির ভাবনা, কাজের পদ্ধতি অনুসারে কাঠ, গাছের ডাল, হাড় এবং ধারাল পাথর দিয়ে কঠিন-কঠিন কাজ অতি সহজে করতে পারতো। এই ব্যাপারটি তারা বুঝতে পরলো। সুবিধা মত বস্তুর আকার দেওয়া যায়, এই ধরনের কল্পনা তাদের স্পষ্ট হলো।

আগের পাঠে আমরা অধ্যয়ন করেছি যে, কুশল মানবের অবশেষের সাথে পাথরের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র ও পাওয়া গিয়াছে। অবশেষের আসে-পাশেও অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র নমুনা থেকে এটা বোঝা যায় যে পুরান যুগের অস্ত্র-শস্ত্র কুশল মানবের দ্বারা তৈরি কিন্তু প্রশ্ন এই যে কুশল মানব কেবল পাথর দিয়ে কি অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করতো? এই প্রশ্নের উত্তর ‘না’ দিতে হবে কেননা তারা অন্য বস্তুও ব্যবহার করে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতো।

তথাপি আজও লক্ষ-লক্ষ বৎসর আগে মানবের দ্বারা বানানো পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায়। হাড়ের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র হয়তো কম পাওয়া যায় কিন্তু কাঠের বা গাছের ডালের তৈরি অস্ত্র খুব শীঘ্র খারাপ হয়ে যায়। এই ধরনের বস্তু পাওয়া যায় না।



পাথর ও হাড়ের দ্বারা তৈরি অস্ত্র-শস্ত্র

১. টুকড়া পাথরের অস্ত্র
২. ধারাল পাথর
৩. গোলাকারের বড় হাতুড়ী
৪. পাতলা পাথরের অস্ত্র
৫. হাড়ের সূচালু অস্ত্র
৬. পশুর সিং দিয়ে তৈরি ছুরি

৬.২ পাষণ যুগের অস্ত্র :

যে কালখন্ডে পাথরের দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায়, সেই কালখন্ডকে ‘পাষণ যুগ’ বলে। পাষণ কথার অর্থ পাথর।

অস্ত্র-শস্ত্রের আকার এবং প্রকারের বিভিন্নতার কারণে পাষণ যুগকে তিন কালখন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. পুরাতন যুগ ২. মধ্যাশ্ব যুগ ৩. নবশ্ব যুগ

পুরাতন যুগ: এই যুগের কুশল মানব এবং সরল মেরুদণ্ডশীল মানব পাথরের উপর পাথর আঘাত করে অস্ত্র-শস্ত্র বানাতো। পাথর দিয়ে পাথরকে পিটিয়ে পাথরের আকার দেওয়ার ক্রিয়াকে ‘আঘাত কৌশল’ বলে। পুরাতন যুগে এই পদ্ধতিতে যে অস্ত্র-শস্ত্র বানাত তাহা টাঁচাবদ্ধতা না থাকার কারণে অস্ত্র-শস্ত্র সুব্যবস্থিত থাকতো না। এই ধরনের অস্ত্রের এক পাশে ধার থাকতো ও অন্য পাশে ধার থাকতো না। এই ধরনের অস্ত্র - শস্ত্র ভঙ্গ অস্ত্র বলা হয়। এই ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার কেবলমাত্র কঠোর ছালযুক্ত ফল এবং হাড় ভাঙ্গার জন্য ব্যবহার করা হতো। কুশল মানবের দ্বারা এই ধরনের অস্ত্র বানানো হয়েছিলো। অস্ত্রের আকার দ্বারা বোঝা যায় যে কুশল মানবের শিকার করার কৌশল

জানা ছিলো না। এই প্রকারের অস্ত্র তৈরী করার সময় ধারালো বা সূচালো ধার রাখতো। মানব এই সূচালো ধার দ্বারা মৃত প্রাণীর চামড়া আলাদা করতো। এ ছাড়াও অন্য পদার্থকে টুকড়া-টুকড়া করা, কাঠ টুকড়া করার জন্য ব্যবহার করতো।

কুশল মানব দ্বারা তৈরী ভঙ্গ অস্ত্র অপেক্ষা সরল মেরুদণ্ডশীল মানবের তৈরী অস্ত্র হাত কুঠার বা ভাল খুবই ভাল, ইহা আকারবদ্ধ ছিল। উচিৎ আকারবদ্ধ অস্ত্র বানাতে হলে প্রথমে মনের পরিকল্পনা করতে হবে। তারপর উচিৎ আকার দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতে সহজ হবে। সরল মেরুদণ্ডশীল মানব এই ধরনের অস্ত্র বানানোর প্রথমে মনে পরিকল্পনা করে নিত যে কোন অস্ত্রের সাহায্যে।

পাথরের উপরের স্তর বের করার জন্য নিলগরু অথবা শিং আছে এমন ধরনের প্রাণীর শিং ব্যবহার করতো। পাথরের পাতলা পরতকে সুন্দর সূচালো করে লম্বা সড়কি তৈরী করতো। এই সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর শিকার করার জন্য ব্যবহার করা হতো।

এই যুগে অস্ত্র-শস্ত্র বানানোর প্রগতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে মেরুদণ্ডশীল মানবের খাবারের মধ্যেও ভিন্নতা পাওয়া যায়। অস্ত্র



বড় খোসা থেকে আবার ছোট খোসা ছাড়ানো।



পাথরের হাতুড়ী

মৃগ শিঙের হাতুড়ী



ছোটো বাকল থেকে ছোটো ছোটো কেটে বার করা



ভাঙরি অস্ত্র



হাত কুড়াল

ব্যবহার করে ছোট বড় বিভিন্ন প্রাণীর শিকার করে তার মাংস খেত। যেমন হরিণ, খরগোশ, জঙ্গলী শূকর শিকার করতো।

শক্তিশালী মানব পাথরের অস্ত্র বানাতে অতি কলাপূর্ণ ছিল। খুব সুন্দর-সুন্দর অস্ত্র তৈরী করতো। ছোট-ছোট আকারের অস্ত্র তৈরী করতে লাগলো।

বুদ্ধিজীবী মানব পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র বানানোর নবীনতম কলা কৌশলের উন্নতি করেছিল। এই কালখন্ডের মানব পাথরের দ্বারা লম্বা এবং পাতলা ফাল বানানোর কলা শিখেছিল। এই লম্বা ফালের দ্বারা ছুরি, সড়কি, সেনী ইত্যাদি দৈনিক ব্যবহারিক অস্ত্র-শস্ত্র বানিয়েছিলো। অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্য বস্তু বানানোর জন্য পাতলা ধারের পাথর এবং হাতিদাত ব্যবহার করতো।

বুদ্ধিজীবী মানব অস্ত্র-শস্ত্র বানানোর কৌশল, পরিবেশের বিবিধ জ্ঞান এবং ভোজন প্রাপ্ত করার বিবিধ কৌশলও উন্নত করেছিলো। যার কারণে বুদ্ধিমান মানব একই সমূহ থেকে ছোট-ছোট ঘর বানিয়ে নিবাস করতে লাগলো। কিছু রীতি নিয়মেরও পালন করতে লাগলো। বুদ্ধিমান মানব দ্বারা তৈরী বিবিধ কলাত্মক বস্তু, গুহাচিত্র

সংস্কৃতির ও উৎসবের সঙ্গে মিল আছে। ধিরে-ধিরে এই মানব আভূষণ ব্যবহার করা শুরু করেছিলো। বিভিন্ন প্রকারের শঙ্খ হাড় ও প্রাণীর দাঁত দিয়ে আভূষণ বানিয়ে পরিধান করতো। বিবিধ কলাকৃতির ও মানবীয় সংস্কৃতির প্রগতি পুরাতন যুগ থেকেই শুরু হয়েছে এরূপ ধারণা করা যায়। ভারতে পুরাতন। যুগের অস্ত্র-শস্ত্রের অবশেষ কাশ্মির থেকে শুরু করে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় কিন্তু পুরাতন যুগের মানবের অবশেষ ভারতে প্রচুর মাত্রায় পাওয়া যায় না।

মধ্য প্রদেশের হোশেন্সাবাদের নিকটে নর্মদা নদীর কিনারায় ‘হথনোরা’ নামে এক গ্রাম আছে। এখানে এই গ্রামের আশে-পাশের পরিবেশে মানবের মাথার খুলী এবং কাঁধের হাড় পাওয়া গিয়াছে। খোঁজ বা অনুসন্ধান করে জানা গিয়াছে যে এই অবশেষ পুরাতন যুগের এক স্ত্রীর। এছাড়াও পাঁড়ুচেরির নিকটবর্তী এক গ্রামের পরিবেশে পুরাতন যুগের এক বালকের মাথার খুলী পাওয়া গিয়াছে। আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় ও পুরাতন যুগে মানবের কিছু অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন যুগের বিশেষ জ্ঞান মহারাষ্ট্রের



পুরাশ্মযুগের গুহাচিত্র : ভিমবেটকা

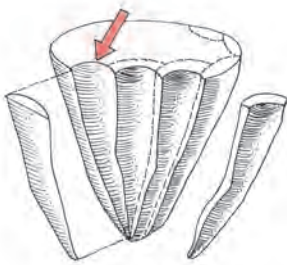
নাশিকের পাশে গঙ্গাপুর এবং নেবাসার পাশে চিরকি-নেবাসা প্রসিদ্ধ স্থান মানা যায়। গঙ্গাপুর, গোদাবরী নদীর কিনারায় অবস্থিত। চিরকি-নেবাসা প্রবরা নদীর কিনারায় অবস্থিত।

মধ্যাশ্মযুগ: মধ্যাশ্মযুগের মানব পুরাতন যুগের মানব অপেক্ষা এক চরন আগে বা উন্নত। এই যুগে জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে মানব জীবনে এত উন্নত দেখা গিয়েছিলো। যুগের সাথে সাথে বুদ্ধিমান মানব শিকার করার সঙ্গে-সঙ্গে পশুপালন ও চাষ-বাস করতে শুরু করলো। দলবেঁধে বুদ্ধিমান মানব এক স্থানে কিছু দিনের জন্য ঘর বেঁধে থাকতে লাগলো এবং ধীরে-ধীরে এক সমূহে থাকতে শুরু করলো। দৈনিক আহারের সঙ্গে বিভিন্ন বনস্পতিও ব্যবহার করতে লাগলো। এই কালখন্ডে বুদ্ধিমান মানবেরা ছাগল-গরু, কুকুর ইত্যাদি প্রাণী পালিত প্রাণী হিসাবে পালন করতে লাগলো। মধ্যাশ্ম যুগের বুদ্ধিমান মানব

শিকার করা, মাছ ধরা, ফসল কাটাই করার জন্য বিবিধ প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার করতো। যে অস্ত্র-শস্ত্র অনেক দিন পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে এই ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র বানিয়ে ব্যবস্থিত রাখা হতো। কাঠিতে অথবা হাড়ের মধ্যে খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে ধারযুক্ত পদার্থ বসিয়ে ছুরি, বর্শা, ভালো তৈরি করতো।

মধ্যাশ্মযুগে অস্ত্র-শস্ত্র বানানোর জন্য যে পাতলা বা ধারাল পাথর ব্যবহার করা হতো এই অস্ত্র খুব ধারালো এবং সুচালো হতো। এই অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বলে। এই কালখন্ডে বাণের মাথায় ধার ও তীক্ষ্ণ ছোট ধরনের পাথর লাগিয়ে বাণের জন্য ব্যবহার করতো। ভারতে অনেক স্থানে মধ্যাশ্মযুগের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। রাজস্থানে বাগৌর, মধ্যপ্রদেশে ভিমবেটকা, গুজরাটের লাজ্ঘণজ আর মহারাষ্ট্রের জলগাও জেলার পাটগে স্থানে কিছু মহত্বপূর্ণ অবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

মধ্যযুগীয় সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যবহৃত পাতাটি ‘পানহালিদার গভা’ কৌশল দ্বারা বড় পাথর থেকে পৃথক করা হয়েছিলো। এই পাতাগুলি নখের মতো বা আকারে কিছুটা বড়, তাই এগুলিকে ‘সুস্মাস্ত্র’ বলা হত। এই সময়কালে ছোট তীরচিহ্নগুলি ব্যবহৃত হত।



পানহালিদার গাব



মধ্যাশ্মযুগের সুস্ম অস্ত্র



মধ্যাশ্মযুগের সুস্ম অস্ত্র
ও তিরের সূচালু ভাগের
ব্যবহার



সুস্মাস্ত্র বসিয়ে তৈরী করা দাঁতযুক্ত ছুরি



মধ্যাশ্মযুগের হাড়ের তৈরী বর্শা

৩. নবায়ুগ : নবায়ুগে যে অস্ত্র-শস্ত্র তাকে নুতন আকার দিয়ে পুনরায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই কালখন্ডে নুতন নুতন প্রকারের অস্ত্র বানানো হয়েছে বা নুতন কলাকৃতির উন্নত হয়েছে। অতএব এই কালখন্ডকে নবায়ু যুগ নাম দেওয়া হয়েছে।

মানব প্রাণীর উন্নতির একটি নুতন প্রবাহ শুরু হয় এই নবায়ু যুগে। নবায়ু যুগের মানব

চাষ-বাস বা পশুপালনের দিকে বিশেষ মহত্ব দিতে শুরু করলো। কেবলমাত্র শিকার করা এটা জীবন নির্বাহের মাধ্যম না মেনে চাষ-বাস বা পশুপালন করা জীবন নির্বাহের প্রধান মানা যেতে লাগলো।

ভারতে অনেক জায়গায় নবায়ু যুগের সংস্কৃতির অবশেষ পাওয়া যায়। গঙ্গা ঘাটের তথা দক্ষিণ ভারতে নব সংস্কৃতির অনেক অবশেষের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

১. কোষ্টক থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে লেখো।

অ) যে কালখন্ডে অস্ত্রে সাধারণত পাথরের তৈরী অস্ত্র পাওয়া যায় সেই কালখন্ডকে ----- কালখন্ড বলে। (তাম্র যুগ, লৌহ যুগ, পাষাণ যুগ)

আ) মহারাষ্ট্রে নাশিকের পাশে ----- স্থানে পুরাতন যুগের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। (গঙ্গাপুর, সিন্ধুর, চাঁদবড়),

২. নীচের মধ্যায় যুগের স্থানের তুল জোড়া খুঁজে লেখো।

অ) রাজস্থান - বাগৌর
আ) মধ্যপ্রদেশ - ভিমবেটকা
ই) গুজরাট - লাজ্ঘনজ
ঈ) মহারাষ্ট্র - বীজাপুর

৩. নীচের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

অ) আঘাত কৌশল কাকে বলে?
আ) বুদ্ধিমান মানব পাথর দিয়ে অস্ত্র বানানোর কৌশল কিভাবে প্রগতি করেছিলো?

৪. পুরাতন যুগ, মধ্যায় যুগ এবং নবায়ু যুগের কালখন্ডের অস্ত্রের তুলনা করো।

৫. নীচের দেওয়া কোন আধুনিক যন্ত্রে পাথরের ব্যবহার করা হয় ?

অ) মিক্সার
আ) আটা চাকী
ই) মসলা কোটার যন্ত্র

৬. ভারতের মানচিত্রে নীচে দেওয়া জায়গার নাম লেখো।

অ) পুরাতন যুগের মহারাষ্ট্রে একটি স্থান
আ) নবায়ু যুগের সংস্কৃতির অবশেষ কোন নদীর ঘাটে পাওয়া যায় এমন একটি স্থানের নাম।
ই) মধ্যপ্রদেশে মধ্যায় যুগের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে এমন একটি স্থানের নাম।

উপক্রম :

তুমি তোমার নিজের পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবসা করে এমন ধরনের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক করো। কে কোন ধরনের ব্যবসা করে, ব্যবসার জন্য কোন-কোন জিনিসের বা অস্ত্রের ব্যবহার হয় তাহা সংকলন করো।



নবায়ুযুগের কুড়াল



৭. গৃহ হইতে গ্রাম-বস্তী পর্য্যন্ত

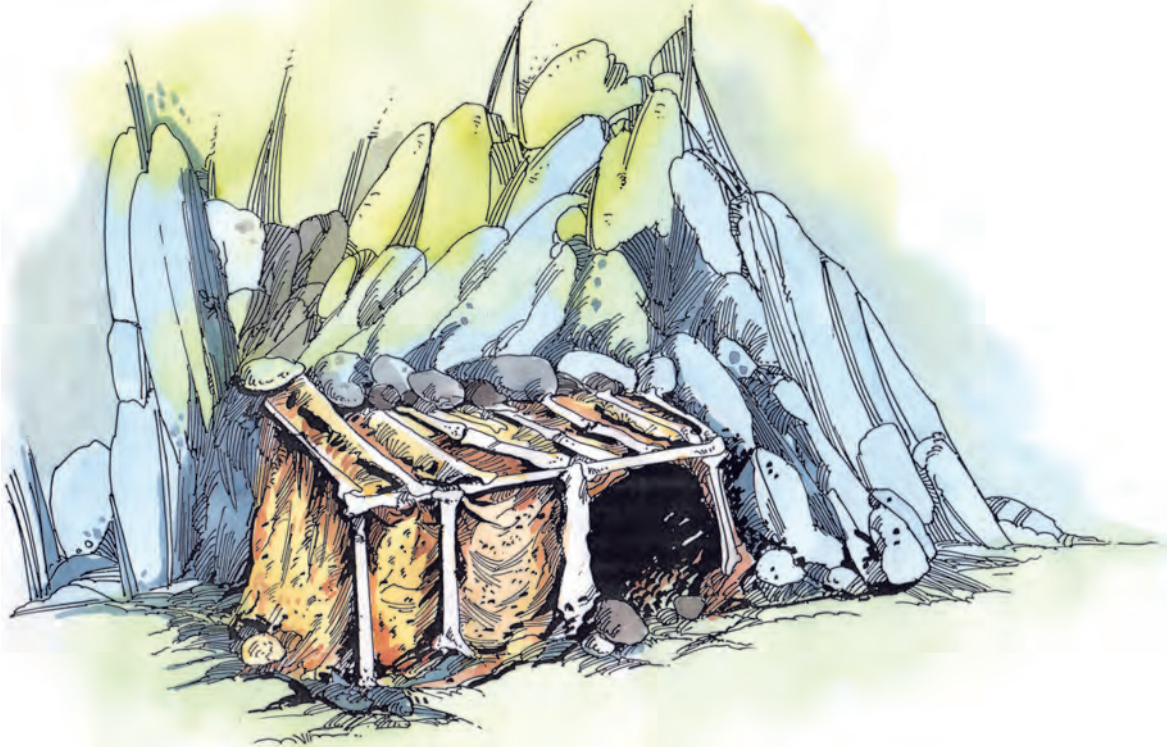
৭.১ গৃহ

৭.২ অস্থায়ী ঘর

৭.৩ গ্রাম - বস্তী

৭.১ গৃহ

আমরা পঞ্চম পাঠে অধ্যয়ন করেছি যে শক্তিশালী মানব গুহা তৈরী করে বসবাস করতো। তখনকার সময় ইউরোপে অত্যন্ত বরফ জমানো শীতল আবহাওয়া ছিলো। শক্তিমান মানব আগুন জ্বালিয়ে ও চামড়ার বস্ত্র পরিধান করে এই শীত হইতে নিজেকে রক্ষা করত কিন্তু এইভাবে জীবন যাপন করা অনুকূল ছিলো না।



ফ্রান্সের একটি গুহার ভিতর হইতে প্রাপ্ত। শক্তিমান মানব দ্বারা তৈরী गरम तबू

অতএব তাহারা গুহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাগে প্রাণীদের চামড়া দ্বারা गरम तबू টানিয়ে ঘরের মত তৈরী করেছে। যেখানে আবশ্যক ছিলো সেখানে তাহারা কুড়ে ঘর বেঁধেছে।

৭.২ অস্থায়ী ঘর

মধ্যাশ্ম যুগীন কালখন্ডে বুদ্ধিজীব মানবের সমুহেরা সম্পূর্ণ বিশ্বে বস্তী তৈরী করেছিলো। মধ্যাশ্ম যুগের জলবায়ু गरम হইতে চলেছিলো। সম্পূর্ণ পর্যাবরনে যেন ক্রমশঃ একটা পরিবর্তনের রেখা দেখা যাচ্ছিলো। সময়ের সাথে-সাথে মধ্যাশ্ম যুগের বুদ্ধিমান মানবদের খাদ্য পদ্ধতিতেও পরিবর্তন হইতে চলেছিলো।

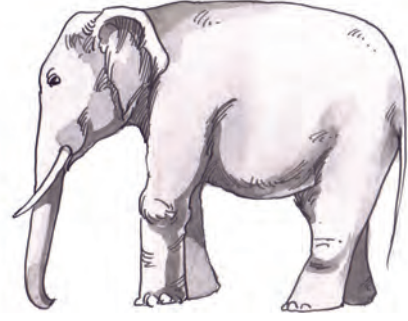
প্রচুর পরিমানে পশু-পাখী হত্যা করা ও পর্যাবরনের ক্রমশঃ পরিবর্তনের কারণে মধ্যাশ্ম যুগে ‘মৈমোথ’ নামে বিশাল আকারের প্রাণী

অদৃশ্য হইতে চলেছিলো। অতএব শিকার করার সাথে-সাথে বুদ্ধিমান মানব প্রচুর মাত্রায় মাছ ধরার কাজ শুরু করেছিলো। ইহার পর তাহারা বন্য শূকর, হরিণ, পাহাড়ী মেঘ (ভেড়া)-ছাগলের মত ছোট প্রাণীদের শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগলো।

মৈমোথ হাতী, হাতীদের পূর্বজ কিন্তু হাতীর তুলনায় আকারে খুবই বিশাল প্রাণী ছিলো।



মৈমোথ



হাতী

পরিবর্তনশীল খাদ্য পদ্ধতির কারণে বুদ্ধিমান মানবের সমূহ দূরের প্রদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিতো। আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুসারে তাহারা ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ঘর তৈরী করে থাকতে লাগলো। বসবাস স্থানের আবহাওয়ার অনুসারে ফসল কাটাই, ফল-কন্দমূল একত্র করা এই সকল কাজ করতো।

মাছ কোন ঋতুতে বেশী পাওয়া, এটা জেনে নিয়ে, মাছ ধরায় অধিক লাভ করতো। শিকার কোন স্থানে অধিক পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে ভ্রমণ করে বেড়াতো। এই সকল কারণের জন্য তাহারা তাঁহাদের অনুকূল ঠিকানা স্থির করে সেখানে দীর্ঘ কাল বসবাস করতো। বনের গাছ-পালা কেটে খোলা স্থানে তাহারা অস্থায়ী রূপে কাঁচা ঘর বেঁধে বসবাস করতো।



মধ্যশায়ুগীন অস্থায়ী নিবাসের কাল্পনিক চিত্র



নবশ্ময়ুগীন গ্রাম ও বস্তীর কাল্পনিক চিত্র

৭.৩ গ্রাম - বসতী

নবশ্ময়ুগের মানবের জীবন পদ্ধতি পুরাশ্ময়ুগীন এবং মধ্যশ্ময়ুগীন জীবন পদ্ধতির তুলনায় সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ছিলো। এই কালখন্ডে মানুষ ফসলের উৎপাদন করেছিলো। ক্ষেতের কাজ আরম্ভ হওয়া, এটাই নবশ্ময়ুগীন সভ্যতার বিশেষতা ছিলো। শিকার ও ফল-কন্দমূল একত্র করবার জন্য এখানে-ওখানে সর্বদা ভ্রমণ করতে হতো, কিন্তু ক্ষেতের কাজ শুরু হওয়াতে অন্ন ভান্ডারে আবশ্যিক খাদ্য সামগ্রীর অভাব হতো

না। অতএব এই কালখন্ডে সদা-সর্বদা শিকার করিবার প্রয়োজন ছিলো না। ফলস্বরূপ সব সময় ভ্রমণের প্রয়োজনও রইলো না। ক্ষেতের কাজ শুরু হওয়াতে এই কালখন্ডের লোকেরা এক স্থানে স্থির হয়ে থাকার প্রয়োজন বোধ করতে লাগলো। অতএব তাহারা স্থায়ী রূপে গ্রাম বস্তী তৈরী করে এক বিশিষ্ট স্থানে স্থির হয়ে থাকতে লাগলো। নবশ্ময়ুগীন গ্রাম বস্তীর সামাজিক রচনা ও সংস্কৃতি প্রভৃতির বিষয়ে আমরা আগামি পাঠে অধ্যয়ন করবো।

অনুশীলনী

১. প্রশ্নগুলীর উত্তর এক বাক্যে লেখো।

- (অ) বুদ্ধিমান মানব কোন-কোন প্রাণীর শিকার প্রচুর পরিমাণে করতো?
- (আ) নবশ্ময়ুগীন সভ্যতার বিশেষতা কি?

২. কারণ লেখো।

- (অ) মধ্যশ্ময়ুগে বুদ্ধিমান মানবের খাদ্য পদ্ধতিতে পরিবর্তন হইতেছিলো।

- (আ) মানুষেরা এক স্থানে দীর্ঘকাল ধরে থাকতে লাগলো।

৩. মধ্যশ্ময়ুগের অস্থায়ী নিবাসের কাল্পনিক চিত্রের নিরীক্ষণ করো এবং নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলীর উত্তর দাও।

- (অ) চিত্রে দেওয়া অনুসারে নিবাসের রচনা কেমন?
- (আ) এই নিবাসগুলী তৈরী করিবার জন্য কোন বস্তুর ব্যবহার করা হয়েছে এমন দেখা যাচ্ছে?

(ই) অঙ্কায়ী নিবাসের মানুষেরা কেমন ধরনের
ব্যবসা করতো ?

উপক্রম

৪. ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের
কারণে দৈনিক জীবনে কিরূপ পরিণাম ঘটে
তাহা লেখো।

৫. নবাব যুগের গ্রাম ও আধুনিক গ্রামের মধ্যে
তুলনা করো।

কার্য্য

ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের নিবাসের প্রতিকৃতি তৈরী
করো।

(অ) কৃষকেরা চাষ করবার সময় অনেক প্রকারের
কাজ করে, জমিতে প্রত্যক্ষ গিয়ে ওই
কাজগুলীর সম্বন্ধে জেনে নাও।

(আ) তোমার আসে-পাসের বিবিধ প্রকারের
পাঁচটি ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎ করো। ওই ঘর,
তৈরী করবার জন্য কোন-কোন বস্তু ব্যবহার
করা হয়েছে, ইহার তালিকা তৈরী করো।

(ই) শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে ভূ-গোলক
(গোলোব) অথবা মানচিত্রে দেখানো
মহাদেশের নিরীক্ষণ করো এবং নিজের
খাতায় অঙ্কন করো।

তোমরা কি এইটা জানো ?

পৃথিবীতে দুইটি কালখন্ড একের পরে এক ক্রমশঃ আসতেই থাকে - একটি হল হিম যুগ অন্যটি অন্তর হিম
যুগ। হিম যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগ বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে। আবহাওয়া অতি শীত এবং শুষ্ক থাকে। সমুদ্রের
জলস্তর অনেক নীচে চলে যায় কারণ জলের অধিকাংশ ভাগ বরফে পরিনত হয়ে যায়। দুইটি হিম যুগের মধ্যের
কালখন্ডকে অন্তর হিম যুগ বলা হয়। অন্তর হিম যুগে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের বরফ অধিক পরিমাণে গলে যায়। ইহার
কারণে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যায়। এই সময়ের আবহাওয়া হিম যুগের আবহাওয়া অপেক্ষা গরম ও আদ্র থাকে।
যে কালখন্ডে পৃথিবীর কিছু ভাগে হিম যুগ ছিলো সেই কালখন্ডে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে প্রচুর মাত্রায় বর্ষা
হয়েছিলো। তদ্রূপ অন্য স্থানে যখন অন্তর হিম যুগ শুরু ছিলো তখন এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কিছু প্রদেশে
বর্ষার পরিমাণ কম হয়ে গিয়েছিলো।

কুশল মানবের কালখন্ডে অর্থাৎ ২৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে আবহাওয়া অতি শীত ও শুষ্ক হইয়াছিলো। বর্তমান
সময় হইতে পিছে গেলে অর্থাৎ আঠারো লক্ষ বৎসর হইতে এগারো হাজার বৎসরের মধ্য কালে হিম যুগ এবং অন্তর
হিম যুগের চারটি প্রমুখ সোপান হয়ে গেছে। পুরাশ্ম যুগ এবং মধ্যাশ্ম যুগের মধ্যের মানবীয় সভ্যতার ইতিহাস এই
কালাবধিতেই ঘটিত হয়েছে। প্রায় এগারো হাজার বৎসর পূর্বের সোপানে হিম যুগ সমাপ্ত হয়ে। অন্তর হিম যুগের
আরম্ভ হয়েছিলো। আবহাওয়া গরম ও আদ্র হইতে লাগলো। কৃষিকার্য্য এবং নবাব যুগের আরম্ভ এই কালাবধিতেই
হয়েছিলো।



৮. স্থায়ী জীবন যাত্রার শুভারম্ভ

৮.১ পশুপালন এবং কৃষিকার্য শুরু করা।

৮.২ বিশিষ্ট কৌশল ও বিভিন্ন ব্যবসা শুরু হওয়া।

৮.৩ পারস্পারিক সহযোগিতার উপর জীবন যাপন।

৮.৪ গৃহ নির্মাণ।

৮.৫ গ্রাম, আত্মীয়তা ও পারিবারিক পরিকল্পনা।

৮.১ পশুপালন এবং কৃষিকার্য শুরু করা

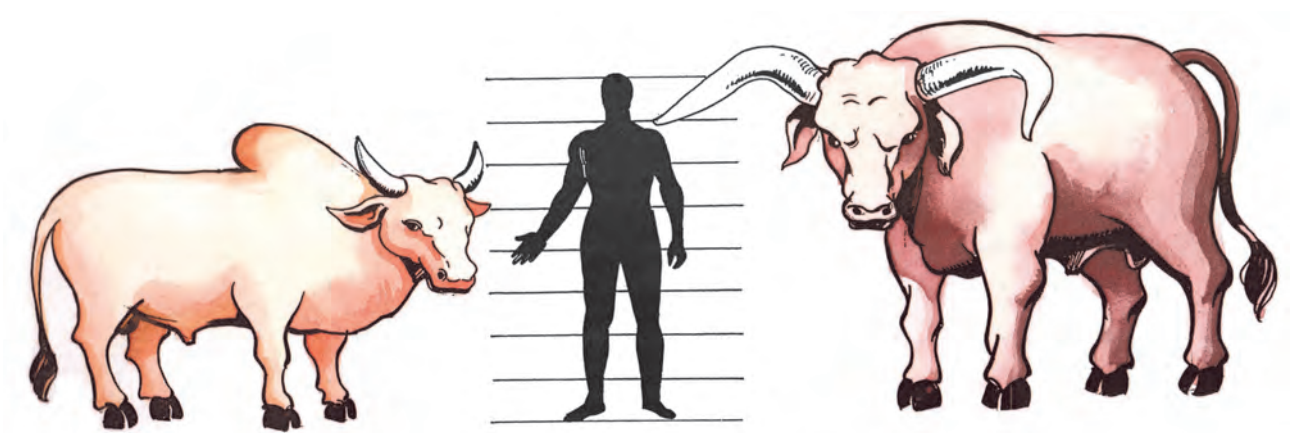
পশুপালন: কুকুর, মেষ (ভেড়া), ছাগল, গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি বন্য পশু ও গৃহপালিত প্রাণী আমাদের অনেক উপকার দেয়। গৃহপালিত পশু তৈরী করার তিন প্রমুখ সোপান ধার্য করা হয়।

১) বন্য পশুদের আবদ্ধ করা।

উক্ত তিন সোপানের কার্য সাধ্য হওয়াকে পশুপালন বলে।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখেছি যে মধ্যযুগে মানব প্রথমেই কুকুরকে গৃহপালিত করে নিয়ে ‘শিকার’ করার কার্যে ব্যবহার করেছে। কুকুরের পরেই ছাগল ভেড়া অন্য পশুদের পোষ মানিয়েছে।

কৃষিকার্য: প্রায় এগারো হাজার বৎসর পূর্বে কৃষিকার্য সর্বপ্রথম ইজরাইল ও ইরাকে শুরু হয়। ওই সময় কৃষিকার্যের শ্রেয় মহিলাদের দেওয়া হয়। মহিলারা ছুঁচলো লাঠির দ্বারা বীজ বপনের কাজ করেছিলো।



বর্তমান সময়ের গরু

গরুর পূর্বজ বন্য গরুর কাল্পনিক ছবি

২) আবদ্ধ করা পশুদের গৃহপালিত করা।

৩) উহাদের দ্বারা দুধ প্রাপ্ত করা এবং পরিশ্রমের কাজ করানো।

এখনও অনেক আদিবাসী ও জনজাতির লোকদের মধ্যে মহিলারাই ছুঁচলো লাঠির দ্বারায় বীজ বপন করে। ছুঁচলো লাঠি যাহাতে মাটির গভীরে প্রবেশ করে তারজন্য ওই লাঠির মধ্যে ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর বসাইয়া দেওয়া হইতো।



বীজ বপনের জন্য ব্যবহৃত ছুঁচালো লাঠি এবং ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর

কৃষিকার্যের জন্য মানুষ এক স্থানে দীর্ঘ সময় কালোতিপাত বসবাস করতে লাগলো। নাঙল (হল) চালানোর জন্য মানুষ-গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পশু ব্যবহৃত করতে লাগলো। উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে লাগিলো।



প্রাচীন ইজিপ্তের প্রচলিত হাল

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হইক এইজন্য মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির দেবী-দেবতার উপাসনা (আরাধনা) করতে লাগলো। কৃষির জন্য স্কুল,



ছুঁচালো লাঠি দিয়ে বপন করা মহিলারা

পেয়জল এবং ইহার সরবরাহ গ্রামের সুরক্ষা পরস্পর সহযোগিতা করা যাতে সুষ্ঠু-সুন্দর হয়, তারজন্য কৃষিপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার উদয় হয়।

৮.২ বিশিষ্ট কৌশল ও বিভিন্ন ব্যবসা শুরু হওয়া।

কৃষিকার্যের পূর্বের যুগে শিকার করা মাংস ও একত্রিত করা, ফল-মূল অল্প দীর্ঘ সময় সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব ছিল না। ওই সময় মানুষ কেবল অন্নের খোঁজেই ব্যস্ত থাকিত। কৃষি কার্যের জন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। কেননা কৃষি কার্যের দ্বারা উৎপাদিত অল্প সঞ্চয় করে রাখা যায়। সমূহের সকলের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর ও কিছু খাদ্যবস্তু অতিরিক্ত বেঁচে থাকতো, এই পরিমাণে ফসল প্রাপ্ত হতে লাগলো। যে কারণে সমূহে কিছু স্ত্রী পুরুষ নুতন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দিতে লাগলো, প্রত্যেকের কলানুসার নুতন কৌশল বিকাশ করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিলো।

মানুষ বিভিন্ন কৌশল ও বুদ্ধির দ্বারা সুখ-সুবিধার সাধন যোগাড় করতে লাগলো। কেহ মাটির ঘড়া, কলসী-বাসন পত্র, কেহ বস্ত্রাদিও কেহ কৃষি বিষয়ক যন্ত্রাদি তৈরী করলো।



হাতের সাহায্যে মাটির বাসন তৈরী করা স্ত্রী

৮.৩ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর জীবন যাপন

কৃষকেরা এখন নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক অল্প উৎপাদন করতে লাগলো। কৃষক, কৃষিকার্যের যন্ত্র আনিতে অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করল। কুমার মাটির ঘড়া, কলসী, বাসন পত্রাদি কৃষক ও যন্ত্র শিল্পীকে দিতে লাগল। বিনিময় ও বিতরণ শুরু হলো। যে যাহার মত উৎপাদিত জিনিষ পত্র দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় শুরু হইলো।

লবন অতি আবশ্যিক বস্তু। অধিকতম গ্রামের লোকেরা বহুদূর থেকে লবন আনিতে লাগিলো। লবন বিক্রেতা অন্য বস্তুর বিনিময়ে লবন দিতে

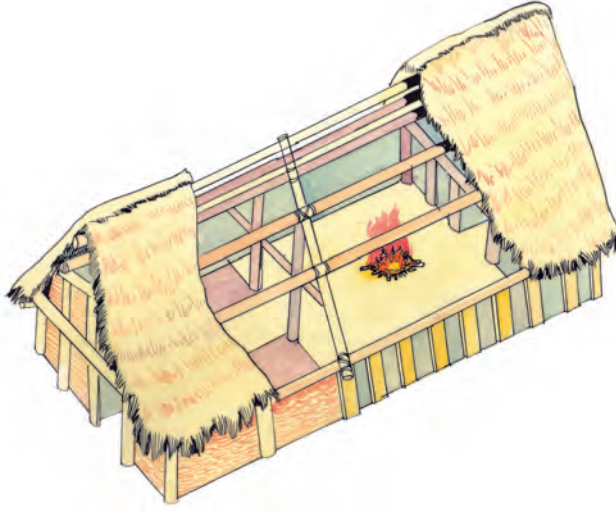
লাগিলো। লবনের ব্যবসার কারণে নবাব যুগের ব্যবসা বিস্তারে সহায়তা প্রাপ্ত হয়।

গ্রামের সুখ-সুবিধার জন্য একে অপরের সাহায্যে, সহানুভূতি করতে লাগলো। গ্রামের লোক মিলিয়া কিছু নিয়ম তৈরী করিলো। এই নিয়মের পালন করার দায়িত্ব যাহার উপর দেওয়া হইল তাহার একটা বিশিষ্ট অধিকারের পদ প্রাপ্ত হইলো।

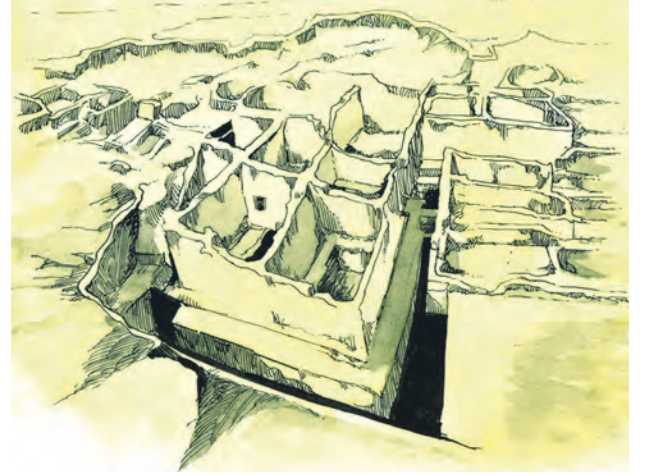
এই বিশিষ্ট অধিকারের ব্যক্তি গ্রাম শাসন করিতে লাগিলো। যাহার কারণে শাসন ব্যবস্থায় উদয় হলো। গ্রামের চতুর্দিকে সুরক্ষার জন্য উঁচু দেওয়াল ও স্থান বিশেষে গভীর গর্ত খনন করা হয়েছিলো। তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। এই উঁচু দেওয়াল ও খাই এরজন্য গ্রামের বিভিন্ন সুরক্ষা হইতো।

৮.৪ গৃহ নির্মাণ

নবাব যুগের প্রারম্ভে পলি মাটির আবাস বানাইতো। কালান্তরে গৃহের পরিবর্তন হতে লাগল। কাঁচা ইঁটের চৌকোনা গৃহ ও একাধিক কামরা হইতে লাগিলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শস্যের উৎপাদন বাড়িলো। ঘরের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিলো। ক্রমশঃ গৃহে বিভিন্ন প্রকারের সুখ সুবিধা বাড়িতে লাগিলো।



ভূমির ভিতর গৃহের অবশেষ এবং গোল খাম্বার চিহ্নের
চৌকোনা ঘরের কাল্পনিক চিত্র



বলুচিস্তানের মেহরগড়ের নবান্ন যুগের বস্তু

৮.৫ গ্রাম, আত্মীয়তা ও পারিবারিক পরিকল্পনা

ঘর-বাড়ি ও গ্রাম নির্মানের ভিত্তিতে
অনুমান করা যায় যে-সম্পূর্ণ গ্রামবাসী সামান্যতঃ
একই বংশের লোকেরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ
আত্মীয়। এই অর্থে বলা যায় যে-সম্পূর্ণ
গ্রামবাসীর বিস্তারিত এক পরিবার। একই বাড়িতে
বসবাসকারী সদস্যরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা

সংযুক্ত ছিলেন, তবে একই সাথে তিনি গ্রামের
একটি বাধিত পরিবারের সদস্যও ছিলেন।

মৃত ব্যক্তিকে গৃহে কিংবা উঠানেই শবদাহ
করিতো। পরিবারের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধ
সমাপ্ত না হয়, এই জন্যই বোধ হয় শব-
দাহের এই ব্যবস্থা। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত সম্পূর্ণ
বস্তুগুলিও দাহ করা হইতো।

অনুশীলনী

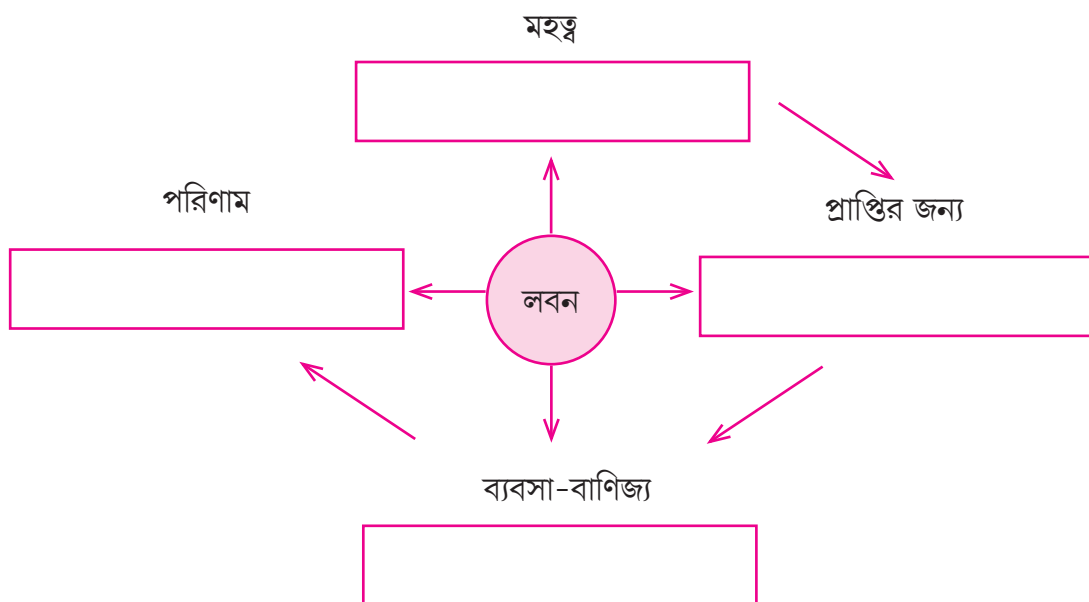
১. বন্ধনী হইতে সঠিক বিকল্প শূন্যস্থানে লেখো :

- অ) প্রায় এগারো হাজার বৎসর পূর্বে কৃষিকার্য
সর্বপ্রথম ইজরাইল ও -----
এখানে পাওয়া যায়। (ইরান, ইরাক, দুবই)
আ) নবান্ন যুগের প্রারম্ভে -----
আবাস বানাইতো।
(মাটির, ইটের, পলিমাটির)

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে দাও :

- অ) মানব দ্বারা বন্য পশুকে গৃহপালিত করার
তিনটি প্রমুখ সোপান কি-কি ?
আ) দলের পুরুষ এবং মহিলারা কীভাবে কারিগর
হয়ে উঠলেন ?

৩. সংকল্পনা চিত্র তৈরী করো :



৪. যে কোন পাঁচটি গৃহপালিত পশুর উপকারিতা লেখো।

৫. বর্তমান সময়ে পুলিশ বিভাগে কোন পশুর ব্যবহার করিতেছে কিভাবে ?

উপক্রম

তোমার পরিসরের যে কোন পাঁচজন ব্যবসায়ীর নিকট গিয়া তাহার ব্যবসা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞানার্জন করো।

□□□

৯. স্থায়ী জীবন এবং নগরীয় সভ্যতা।

৯.১ ধাতুর ব্যবহার

৯.২ চাকায় তৈরী করা বাসন-পত্র

৯.৩ ব্যবসা এবং পরিবহন

৯.৪ নগরের উদয় এবং লিপি

৯.৫ নগরীয় সমাজব্যবস্থা

৯.১ ধাতুর ব্যবহার



বল্লেরিয়ায় কবরস্থান থেকে পাওয়া সোনার প্রাচীন বস্তু

মানব সর্বপ্রথম কোন ধাতুর ব্যবহার করেছিলো, এই সম্বন্ধে আমাদের মনে কৌতূহল জাগে। ইউরোপের বস্তু সংগ্রহালয়ে সংগ্রহিত প্রাচীন বস্তুর বর্গিকরণ করার জন্য, খ্রিস্টন থম্‌সে নামক অধ্যাতা ‘ত্রিযুগ পদ্ধতি’ নামক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি বস্তুগুলিকে তিনটি দলে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন।

১) পাথরের অস্ত্র - অশ্ম যুগ

২) তামার অস্ত্র ও অন্য বস্তু - তাম্র যুগ

৩) লোহার অস্ত্র ও অন্য বস্তু - লৌহ যুগ

এই বর্গিকরণ নির্ধারিত করার সময় পাথরের অস্ত্র পূর্ব কালখন্ডের, তামার অস্ত্র ও অন্য বস্তুর কালখন্ড পূর্ব কালখন্ডের পরের এবং লোহার অস্ত্র ও অন্য বস্তুর কালখন্ড তামার কালখন্ডের পরের এটা থাম্‌সন প্রমাণ সহিত দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই অনুসারে কালখন্ডকে - অশ্ম যুগ, তাম্র যুগ এবং লৌহ যুগ নামকরণ করেন। অতএব সাধারণ ভাবে এই মান্যতা হলো, যে সর্বপ্রথম তামা এই ধাতু ব্যবহৃত হয়েছিলো।

কিন্তু বাস্তবে প্রথম স্বর্ণ ধাতুর ব্যবহার করা হয়েছিলো। স্বর্ণ ধাতু প্রাকৃতিক রূপে কোমল এবং মোলায়েম হয়। তাই সোনা এই ধাতু দিয়ে অস্ত্র এবং যন্ত্র বানাতে ব্যবহার করা যেতো না। সোনার পশ্চাতে মানুষ আরও একটি ধাতুর খোঁজ করলো। এই ধাতু দিয়ে মানুষের অস্ত্র এবং যন্ত্র বানানো সম্ভব হলো। এই ধাতুটিই হলো ‘তাম্র’। যে কালখণ্ডে তাম্র ব্যবহার শুরু হলো ওই কালখণ্ডকে ‘তাম্র যুগ’ বলা হয়।

কালখণ্ডে সুডৌল এবং সুন্দর নকশাদার রঙ্গীন পাত্র বানাতে লাগলো। এই পাত্র এবং অন্য বস্তু তৈরী করা কুশল শ্রমিকেরা কাজের সুবিধা অনুসারে গ্রামের কোন নিশ্চিত স্থানে থাকতে লাগলো। আমরা বলতে পারি যে গ্রামে কুশল শ্রমিকের বস্তু এবং বস্তুর উৎপাদন কেন্দ্রের একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র নির্মিত হলো। কিন্তু এই কেন্দ্রটি সেখানেই হলো, যে গ্রামে কাঁচা মাল



৯.২ চাকায় তৈরী করা বাসন পাত্র :

তাম্র যুগ হল নুতন-নুতন আবিষ্কার এবং খুব বেগে পরিবর্তন হওয়া যুগ। এই কালখণ্ডে খুবই মহত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয় এবং সেইটি হল চাকা। সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া হয় যে সর্বপ্রথম মানুষ চাকার ব্যবহার মাটির পাত্র তৈরী করতেই করেছিলো। কালান্তরে চাকার ব্যবহার যান-বাহনের জন্য করতে লাগলো।

সহজেই পাওয়া যেত এবং যে গ্রাম ব্যবসার দৃষ্টিতে সুবিধাজনক ছিলো। অতএব সেই গ্রামের বিস্তার হয়েছিলো।

বস্তুর উৎপাদন অধিক পরিমাণে শুরু হওয়াতে ব্যবসা বৃদ্ধি হয়। এই কারণে পরিবহন পদ্ধতিতে পরিবর্তন হওয়া আবশ্যিক ছিলো। এই কালখণ্ডেই চাকার গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছিলো।

৯.৩ ব্যবসা এবং পরিবহন

চাকায় পাত্র তৈরী করা শুরু হতেই বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হলো। এই

৯.৪ নগরের উদয় এবং লিপি

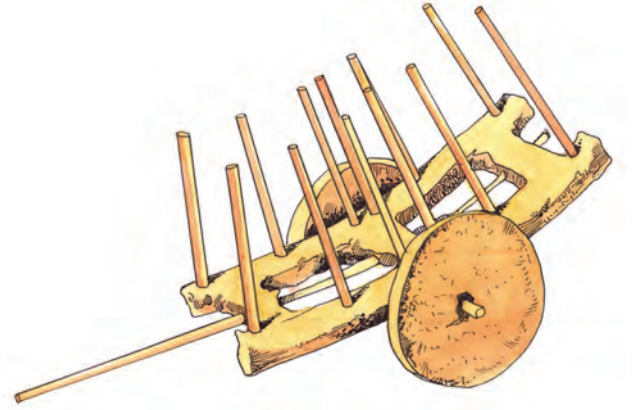
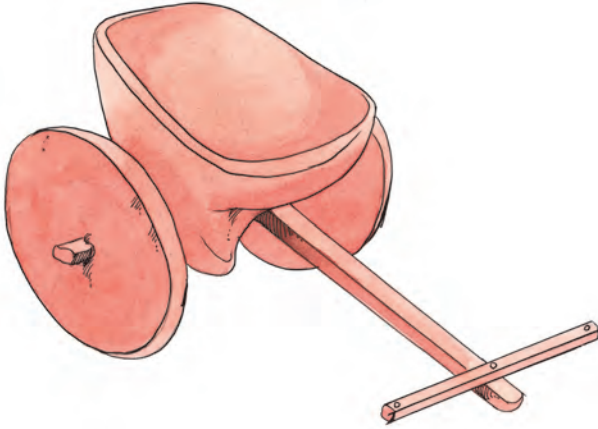
দূর-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ব্যবসা, বস্তুর দ্রুত গতিতে পরিবহন এবং অধিক পরিমাণে

উৎপাদন করা উৎপাদন কেন্দ্রের কারণে অনেক ধরনের কাজ করা শ্রমিকেরা এক স্থানে থাকতে লাগলো ও নগরের উদয় হলো। ব্যবসা এবং

হতো। সংকেতিক চিহ্নযুক্ত খাপড়া অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যবসা এবং উৎপাদনে বৃদ্ধি এবং হিসাব-কিতাব রাখার প্রয়োজন বেশী



চাকার গাড়ির সর্বপ্রথম ব্যবহার মেসোপটেমিয়ায় করা হয়।



হড়প্পা সভ্যতা (সিন্ধু সভ্যতা) ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক প্রাচীন নগরীয় সভ্যতা ছিলো।

এই সভ্যতার চাকাওয়ালা খেলনা

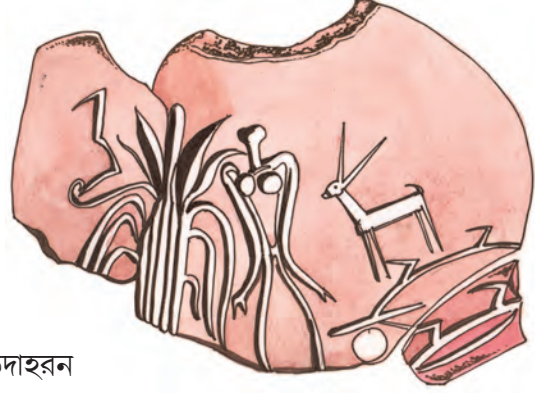
উৎপাদনের বৃদ্ধির সাথে স্থায়ী ভাবে হিসাব রাখা আবশ্যিক মনে হলো।

হিসাব-কিতাব রাখতে সংকেতিক চিহ্ন এবং প্রতিকের ব্যবহার পূর্ব কালখন্ডেও

হওয়ার কারণে পূর্বে ব্যবহৃত সংকেতিক চিহ্ন এবং প্রতিকের বদল হতে লাগলো। চিহ্নগুলি সংস্কারিত করা হলো। এইভাবে প্রত্যেক সংস্কৃতির নিজ-নিজ লিপি উৎপন্ন হলো।



প্রাচীন সংকেতিক দাগ ও চিহ্নের উদাহরন



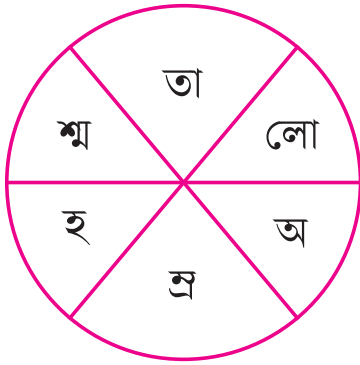
৯.৫ নগরীয় সমাজ ব্যবস্থা :

সম্পূর্ণ বিশ্বে নগরীয় সভ্যতার উদয় ও উন্নতি হলো এবং এর মুখ্য কারণ হলো ব্যবসায় সমৃদ্ধি, তথাপি ওই নগরীয় সভ্যতার ভিত্তি নবাব্বা যুগের কৃষি সংস্কৃতির উপর আধারিত ছিলো। কৃষি সংস্কৃতিতে যে শ্রদ্ধা এবং মান্যতা প্রচলিত হয়েছিলো, সেগুলি নগরীয় সভ্যতায় অবাধিত ছিলো। ব্যাপার সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সু-সম্পন্ন। নগরে প্রচলিত শ্রদ্ধার উপরে আধারিত সামূহিক

আচরন এবং উৎসব-পর্বের মহত্ব বেশী হলো। অনেক নগরে দর্শনীয় মন্দিরের নির্মাণ করানো হয়েছিলো। তৎকালিন নগরের শাসন ব্যবস্থার অধিকারও মন্দির প্রমুখের নিয়ন্ত্রনে চলে এলো। কালান্তরে মন্দিরের প্রমুখপদ এবং রাজ্যপদ একই ব্যক্তির কাছে এলো। বিশ্বের প্রাচীন নগরীয় সভ্যতা এখানেই আরম্ভ হয়েছিলো। এই সভ্যতার বিস্তৃত জানকারী আমরা পরের পাঠে পড়বো।

অনুশীলনী

১. নিম্ন বৃত্তে বস্তুর কালখন্ডের তিন সমূহ খোঁজ করো এবং সম্বন্ধিত বাক্যের সামনে লেখো।



- অ) পাথরের অস্ত্র ----- যুগ
আ) তামার অস্ত্র ও অন্য বস্তু ----- যুগ
ই) লোহার অস্ত্র ও অন্য বস্তু ----- যুগ

২. নিম্ন ঘটক কালখন্ডের অনুসারে যোগ্য ক্রমে লেখো।

- (অ) (১) তামা (২) স্বর্ণ (৩) লৌহ
১) ----- ২) ----- ৩) -----

- আ) (১) তাম্র যুগ (২) লৌহ যুগ (৩) অশ্ব যুগ
১) ----- ২) ----- ৩) -----

৩. নিম্ন ঘটনার পরিণাম লেখো।

- (অ) তামা ধাতুর আবিষ্কার : -----
(আ) চাকার খোঁজ : -----
(ই) লিপি জ্ঞান : -----

৪. টিপ্সনী লেখো।

- (অ) ধাতুর ব্যবহার
(আ) নগরীয় সমাজ ব্যবস্থা

উপক্রম

(অ) তুমি তোমার ঘরের বিভিন্ন বস্তুর সূচী তৈরী
করো এবং ঐগুলী কোন ধাতুর তৈরী
তাহা লেখো।

(আ) বিবিধ ভাষার পরিচ্ছেদ সংগ্রহ করে নিজের
খাতায় লাগাও। ঐ পরিচ্ছেদগুলীর লিপি
দেখে তোমার কি মনে হয় তাহা লেখো।

তোমার কি ইহা জানা আছে ?



(১)

(২)

(৩)



রোজেটা শিলালেখ

রোজেটা স্টোন নামে পরিচিত শিলালেখের খোঁজ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হয়। এই শিলালেখের পাথর ভাঙ্গা থাকার কারণে ইহার মূল শিলালেখের কেবল মাত্র এক ভাগ বেঁচে আছে। শিলালেখ ইজিপ্শিয়ান ভাষায় লেখা। বর্তমানে এই শিলালেখ লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যে পাথরের তিন ভাগে তিনটি আলাদা-আলাদা লেখন লেখা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে একই লেখা তিনটি আলাদা-আলাদা লিপিতে লেখা হয়েছে। সবচেয়ে উপরের লিপি হল প্রাচীন ইজিপ্তের চিত্রলিপি। এই লিপিকে ‘হায়রোগ্লিফস’ (দেবলিপি) বলা হয়। মধ্যভাগের লিপিটির দৈনিক ব্যবহারে সমাবেশ ছিল। এই লিপিটি ‘ডেমোটিক’ (দলিলপত্র লেখার জন্য ব্যবহৃত) লিপি নামে জানা হয়। এই লিপি ইজিপ্তের প্রাচীন চিত্রলিপি থেকে তৈরী হয়েছে। তৃতীয় লিপি হল ‘গ্রীক’ লিপি।

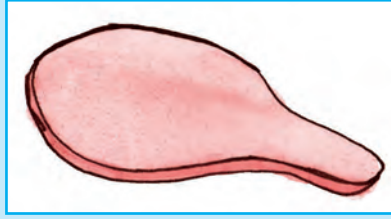
এই লেখে ইজিপ্তের টালেমী (পঞ্চম) নামক রাজার রাজগদীতে বসার ঘোষণা করা হয়েছে। ইজিপ্তের ঐতিহাসিক সাধনরূপে এই শিলালেখের একটি বিশেষ মহত্ত্ব আছে, কারণ তিন লিপিতে লেখাটি লেখার জন্য প্রাচীন ইজিপ্তের বিস্তৃত চিত্রলিপি পড়া সম্ভব হয়েছে। এই শিলালেখের গ্রীক লিপির সাহায্যে ডেমোটিক লিপির ‘টালমিস’ এই শব্দটি পড়া সম্ভব হয়েছে, কালান্তরে জাঁফ্রাস্মা শাম্পোলিয়ন নামের একজন ফ্রেঞ্চ শিক্ষক এই লিপি পড়তে পেরেছিলেন। টালমিস শব্দ পড়তে পারায় ইজিপ্তের শিলালেখ উল্লেখিত বিদেশী নামগুলী পড়া সম্ভব, ইহা শাম্পোলিয়ন বুঝতে পারলেন। সে বিদেশী নামগুলী পড়ে, ঐ অনুরূপ চিত্রলিপির বর্ণের সূচী তৈরী করলেন। এইভাবে শাম্পোলিয়ন প্রাচীন ইজিপ্তের চিত্রলিপি সফলতাপূর্বক পড়তে পেরেছিলেন, যে লিপীগুলী বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্ব থেকে তামার ব্যবহার করা হত, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে প্রদেশে তামা দুর্লভ ছিল, সেখানে তামার ব্যবহার অধিক পরিমাণে সম্ভব ছিল না। অতএব তামার ব্যবহার কিভাবে করা হয় ইহা জানা সত্ত্বেও সেখানে বেশীর ভাগে পাথরের অস্ত্র এবং যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। ঐ সকল স্থানে উৎখান করার পরে খুব কম মাত্রায় তামার বস্তু পাওয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থানকে ‘তাম্রযুগের স্থান’ না বলে ‘তাম্রপাষণ যুগের’ স্থান বলা হয়।

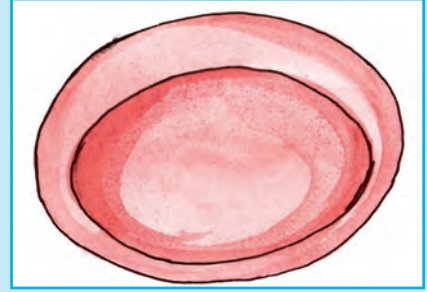
তামা এই ধাতু সোনার তুলনায় কঠোর কিন্তু কোনো বস্তু তৈরী করার দৃষ্টিতে তামা নরম হয়। তামায় জস্তা ধাতু মিশ্রিত করলে উপযুক্ত পরিমাণে কঠোরতা আসে। তামা এবং রাঙ এর মিশ্রধাতুকে ‘কাঁসা’ কাঁস্য বলা হয়। নবাব্বা যুগের মানব বস্তু তৈরী করার জন্য কাঁসা এই ধাতুর ব্যবহার করতে লাগলো। অতএব এই কালখন্ডকে ‘কাঁস্য যুগ’ ও বলা হয়। মিশ্র ধাতু তৈরী করতে হলে ধাতুকে গলাতে হয়। জস্তা এবং রাঙ কিভাবে গলাতে হয় তাহা কাঁসা তৈরী করার প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব থেকেই মানুষের জানা ছিলো।



ঘড়া



আয়না



থালী

তামার বস্তু - সিদ্ধু সংস্কৃতি



১০. ঐতিহাসিক কালখন্ড

১০.১ সংস্কৃতি কাকে বলে ?

১০.২ নদীঘাটের নগরীয় সভ্যতা

১০.৩ বিভিন্ন সভ্যতা : মেসোপোটেমিয়া,
ইজিপ্ত, চীন, হডপ্পা

১০.৪ খেলা এবং মনোরঞ্জন

দ্বিতীয় পাঠে আমরা অধ্যয়ন করেছি যে-যে কালখন্ডের ইতিহাস লেখার জন্য গ্রন্থ, পান্ডুলিপি ইত্যাদি লিখিত প্রমাণ উপলব্ধ আছে, ঐ কালখন্ডকে ঐতিহাসিক কালখন্ড বলা হয়। সম্পূর্ণ পুরাতন নগরীয় সভ্যতায় উন্নত লিপির সাহায্যে ইতিহাসের লেখন করা হতো। ইহার অর্থ এই যে নগরীয় সভ্যতা উদয়ের সাথে-সাথে নবাব্দ যুগের প্রাগৈতিহাসিক কালখন্ড সমাপ্ত হল এবং ঐতিহাসিক কালখণ্ড আরম্ভ হলো।

১০.১ সংস্কৃতি কাকে বলে ?

মানব এবং অন্য প্রাণীদের নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে আশে-পাশের পরিবেশ এবং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর থাকতে হয়। সেই প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করার সময় অন্য প্রাণী নিজের পরিবেশ এবং প্রকৃতিতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটায় না। যেমন, ভালুক গুহায় থাকে। বানর গাছে থাকে কিন্তু মানুষ নিজের জন্য ঘর তৈরী করে নেয়। অতএব মানুষ নিজের পরিবেশের প্রাকৃতিক স্বরূপ ও রচনা কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত করে। মানব প্রকৃতি থেকে পাওয়া অন্ন ও খাদ্য অন্য প্রাণীদের মত কাঁচা খায় না। উহারা অন্নকে রান্না করে খায়। কাঁচা অন্ন পদার্থের উপর প্রক্রিয়া করা হয়। এইভাবে মানুষ বিভিন্ন পদার্থের উপর সংস্কার করতে থাকে। পাথর, ধাতু ইত্যাদির উপর সংস্কার করে বিবিধ অস্ত্র এবং বস্তু তৈরী

করে। মাটি দিয়ে পাত্র, ইট এবং অন্য বস্তু তৈরী করে। কাপাস দিয়ে সূতা ও সুতা দিয়ে কাপড় তৈরী করে। সংক্ষেপে প্রকৃতি থেকে যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, মানুষ তাহার স্বরূপকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করে। এইরূপ পরিবর্তন অথবা সংস্কার করার জন্য মানুষের কৌশলের প্রয়োজন হয়। যে বস্তুর প্রয়োজন হয় সেই বস্তু তৈরী করার পূর্বে তার সম্বন্ধে মানুষকে চিন্তা করতে হয়। এইরূপ বিচার, কৌশল এবং পরিশ্রম করার পরম্পরার ফলে অনেক কলা-কৌশল নির্মিত হয়েছিলো। এই কলা এবং পরম্পরার জ্ঞান পুরুষানুক্রমে একে অপরকে দিতে লাগলো। ইহার জন্য বিচারের আদান প্রদান শুরু হলো। এই আদান প্রদানের মাধ্যমে ভাষাও সম্পন্ন হইতে রইলো। বিভিন্ন কলা কৌশল এবং পরম্পরার বংশানুক্রমে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং ওই জ্ঞানের আধারে নির্মিত জীবন পদ্ধতিকেই সংস্কৃতি বলে।

১০.২ নদী ঘাটের নগরীয় সভ্যতা :

নবাব্দ যুগের সভ্যতা কৃষিপ্রধান জীবনের উপর নির্ভর ছিলো। উত্তম প্রকারের কৃষি উৎপাদনের জন্য উর্বর ভূমি এবং বারোমাস। জলপূর্তির প্রয়োজন হয়। অতএব স্বাভাবিক রূপে নবাব্দ যুগের মানব নদীর তীরে গ্রাম বসতি শুরু করলো। এই কারণে নদী ঘাটিতে নবাব্দ যুগের সভ্যতার বিকাশ হয়েছিলো।

বিভিন্ন কৌশলের জন্য উৎপাদনে বৃদ্ধি, হলো, চাকার ব্যবহার, ব্যবসায় সু-সম্পন্নতা, উন্নত লিপির ব্যবহার প্রভৃতি নবাব্দ যুগের সংস্কৃতি থেকে নগরীয় সভ্যতার উদয় হয়। বিশ্বের চার প্রদেশে প্রায় একই কালখন্ডে অর্থাৎ খ্রীষ্ট



পূর্ব প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে নগরীয় সভ্যতার উদয় হয়। মেসোপোটেমিয়া, ইজিপ্ত, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং চীন এগুলিই হল সেই চার প্রদেশ। নদীর তটীয় প্রদেশে এই সভ্যতাগুলি উন্নতির শিখরে পৌঁছায়। তাই এই চার প্রদেশের সভ্যতাগুলিকে নদী ঘাটির নগরীয় সভ্যতা বলা হয়।

১০.৩ বিভিন্ন সভ্যতা : মেসোপোটেমিয়া, ইজিপ্ত, চীন, হুয়াংহো

মেসোপোটেমিয়া : মেসোপোটেমিয়া এটি কোনো দেশের নাম নয় বরঞ্চ ইহা হলো একটি প্রদেশের নাম। ‘মেসোপোটেমিয়া’ শব্দের অর্থ হল দুইটি নদীর মাঝের প্রদেশ, অর্থাৎ ‘দো-আব’। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া টায়গ্রিস এবং

ইউফ্রেটিস এই দুই নদীর মাঝের প্রদেশ। এই দুইটি নদী মুখ্য ভাবে তুর্কিস্তান, সিরিয়া এবং ইরাক দেশে প্রবাহিত হয়। মেসোপোটেমিয়া প্রদেশে উর, উরুক, নিম্মুর এই ধরনের প্রাচীন নগর ছিলো। এই নগরগুলিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতির প্রচলন ছিলো।

ইজিপ্ত : আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে সাহারা মরুভূমির পূর্ব ভাগে নীল নদী প্রবাহিত হয়। এই নদীর ঘাটিতে পৃথিবীর একটি সমৃদ্ধশালী প্রাচীন নগরীয় সভ্যতার উদয় হয়ে উন্নতি করেছিলো। ইহাই হলো ইজিপ্তের প্রাচীন সভ্যতা। নীল নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা হয়। এই বন্যার কারণে নীল নদীর তীরে প্রচুর পরিমাণে

পলি-মাটি সংগ্রহিত হয় ফলস্বরূপ নদীর তটীয় ভূমি খুবই উর্বরক হয়ে গিয়েছে। ইজিপ্তের প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা স্থানে-স্থানে ছোট বাঁধ তৈরী করে নীল নদীর বন্যার জল সংগ্রহ করতো। ঘোলা জলের ময়লা-মাটি জলের নীচে জমাট হওয়ার পরে উপরের স্বচ্ছ জল জলসেঁচের জন্য ব্যবহার করতো।

চীন : চীনের হুয়াং হো নদীর ঘাটিতে চীনের নগরীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিলো। চীনের পরম্পরা অনুসারে হুয়াং দী নামক রাজা কৃষি, পশুপালন, চাকাওয়ালা বাহন, নৌকা, বস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি আরম্ভ করলেন। লোকে ইহাও মানে যে রেশম উৎপাদন এবং রেশমকে রং করার সিদ্ধান্ত হুয়াং দী রাজার রানীই খুঁজে পেয়েছিলেন। চীনের লোয়াং, বীজিঙ্গ ও চাঙ্গান নগর এগুলি মহত্বপূর্ণ নগর ছিলো।

হড়প্পা সভ্যতা : ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা পুরাতন সংস্কৃতি ‘হড়প্পা সভ্যতা’ নামে জানা হয়। এই সভ্যতা সিন্ধু নদীর তীরে উৎপত্তি হয়েছিলো। পাঞ্জাবের হড়প্পা এবং সিন্ধুর মেহেঞ্জোদড়ো এই দুই স্থানে সর্বপ্রথম সিন্ধু সভ্যতার খোঁজ পাওয়া যায়। এখন তাহা পাকিস্তানে রয়েছে। গুজরাটে লোথল ও ধোলবীরা, রাজস্থানে কালিবঙ্গা, ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতার কিছু প্রসিদ্ধ স্থান।



সিন্ধু সভ্যতায় নগর রচনা অনুপাতবদ্ধ ছিলো। রাস্তাগুলি একে-অপরের সমান্তর এবং সমকোনে কাটা চতুর্ভুজাকার স্থানে তখনকার লোকেরা ঘর তৈরী করতো। শস্য সংগ্রহের জন্য প্রকান্ত গোদাম, প্রশস্ত ঘর এই নগরের বিশেষতা ছিলো। ময়লা জলের ব্যবস্থাপনার জন্য নালী, প্রত্যেক ঘরে স্নানগৃহ, শৌচালয় ইত্যাদি স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানাপন্ন সার্বজনিক ব্যবস্থা ছিল। ব্যক্তিগত এবং সর্বজনিক কুয়া ছিলো, যেগুলি সুব্যবস্থিত ভাবে তৈরী করা হয়েছিলো। নগরে দুই থেকে চারটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলো। প্রত্যেক বিভাগ স্বতন্ত্র প্রাচীর দ্বারা ঘিরে সুরক্ষিত করা হয়েছিলো।

হড়প্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হলো পাকা, পোড়ানো এবং টনটনে মাটির পাত্র। এই পাত্রগুলির রং লাল ও ইহার উপর অশ্বখের পাত, মাছের আঁশ এইরূপ বিবিধ চিত্র অংকন করা হইতো। রঙিন পাথরের মনি ও কাঁশার বস্ত্র তৈরী করায় হড়প্পা সংস্কৃতির কারিগর বৃন্দ অতিশয় কৃশগ্র ছিলেন। মেসোপোটেমিয়ায় এই বস্ত্রগুলির ব্যাপক চাহিদা ছিলো। যদিও হড়প্পা সংস্কৃতির দেব-দেবীদের নাম জানা যায় নি, বিশ্বাস করা হয় যে তারা সেখানে পাওয়া মাটির প্রতিমা এবং মুদ্রার ভিত্তিতে মাতৃ দেবতা এবং পশুপতির পূজা করেছিলেন।



হড়প্পা কালের মুদ্রা এবং মূর্তি

১০.৪ খেলা এবং মনোরঞ্জন

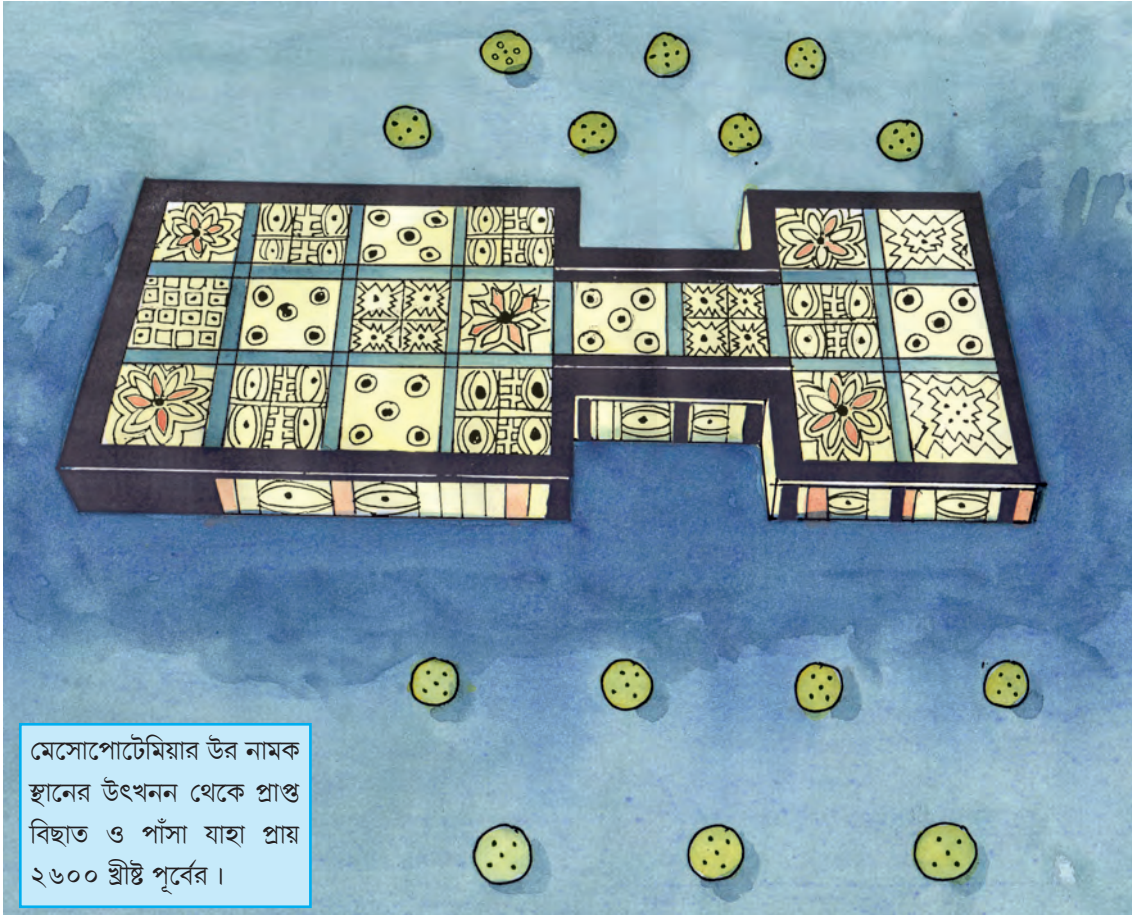
প্রাচীন নগরীয় সভ্যতায় খেলা এবং মনোরঞ্জনের বিভিন্ন প্রকার ছিলো। ইহার মধ্যে প্রমুখ খেলা ছিল শিকার করা এবং কুস্তি



সিংহ শিকারকারী রাজা

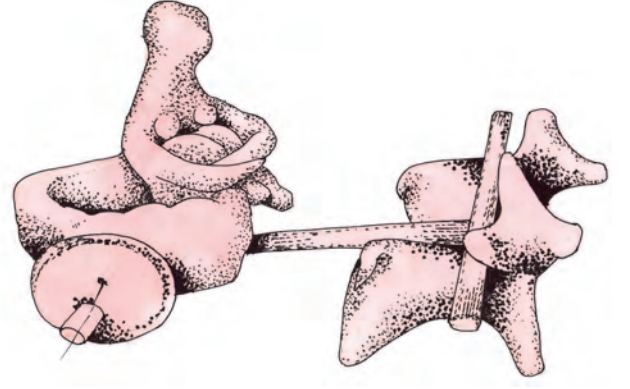


কুস্তি করা মল্লা



মেসোপটেমিয়ার উর নামক স্থানের উৎখনন থেকে প্রাপ্ত বিছাত ও পাঁসা যাহা প্রায় ২৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বের।

প্রাচীন ইজিপ্তে দাবা খেলার মত ‘সেনাত’ নামক একটি লোকপ্রিয় খেলা ছিলো যাহা বিছাত ও পাঁসা দ্বারা খেলা হতো। প্রাচীন চীনেও বিছাত এবং পাঁসার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের খেলা খেলতো। মেসোপটেমিয়া এবং হড়প্পা সভ্যতার লোকেরা বিছাত ও পাঁসা খেলা খুবই পছন্দ করতো।

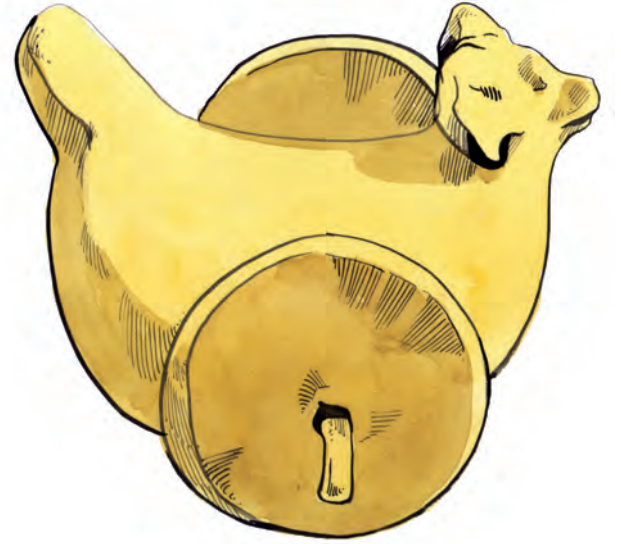


হড়প্পা কালের খেলনা



হড়প্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থানের উৎখাননে পাওয়া মাটির এই বস্তুগুলি পাঁসা রূপে ব্যবহার করা হতো। এই ধরনের অনুমান কিছু পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞেরা করেছেন।

হড়প্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থানের উৎখাননে ছোটো ছেলে-মেয়েদের খেলার বিভিন্ন খেলনা পাওয়া গিয়াছে। তারমধ্যে লাটিম, বাঁশী, কুমকুমি, গরুর গাড়ি, চাকায়ুক্ত প্রাণী ও পাখি প্রভৃতি খেলনার সমাবেশ ছিলো।



হড়প্পা কালের খেলনা

প্রাচীন নগরীয় সভ্যতায় খেলার মতো সঙ্গীত এবং নৃত্যেরও খুব মহত্ব ছিলো। যে কোনো উৎসব কিংবা পর্বের সময় সঙ্গীত এবং নৃত্যের আয়োজন অবশ্যই করা হতো। তখনকার সময় অনেক প্রকারের বাদ্যের ব্যবহার করা হতো। ‘বালাগ’ নামের বাদ্যযন্ত্র মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত ছিলো। সারঙ্গী ইহাও একটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। এ ছাড়াও ঝাঁজ, বাঁশরী, ঢোলে এই

ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা হতো। ইজিপ্তের রাজাদের ‘ফ্যায়রো’ বলা হতো। বিশিষ্ট উৎসব পর্বের সময় স্বয়ং রাজাও নৃত্যে সন্মিলিত হইতেন। হড়প্পা সভ্যতায়ও নৃত্যের বিশেষ মহত্ব ছিলো, এই ধরনের অনুমান মাহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নৃত্যঙ্গনায় কাঁসামূর্তি থেকে করা যেতে পারে।

অশ্ব যুগ থেকে মানবীয় সভ্যতা আরম্ভ হয়ে উন্নত নগরীয় সভ্যতার সোপান পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছালো এগুলী আমরা দেখলাম। আগামি বৎসর আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে বিকসিত হড়প্পা সভ্যতার বিস্তৃত অধ্যয়ন করবো। এইরূপে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেরও অধ্যয়ন করবো।



বালাগ

মেসোপোটেমিয়ার ‘উর’ নামক নগরের উৎখননে পাওয়া স্বর্ণ বালাগ, ইহা ১১ টি তারের বাদ্য যন্ত্র। ইহার উঁচু প্রায় ২.১ মীটার। ইহা প্রায় ২৬৫০ খ্রীষ্ট পূর্বের বাদ্য যন্ত্র। উক্ত ছবির বালাগ বাদ্য পুয়াবি নামক রানীর সমাধি থেকে পাওয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

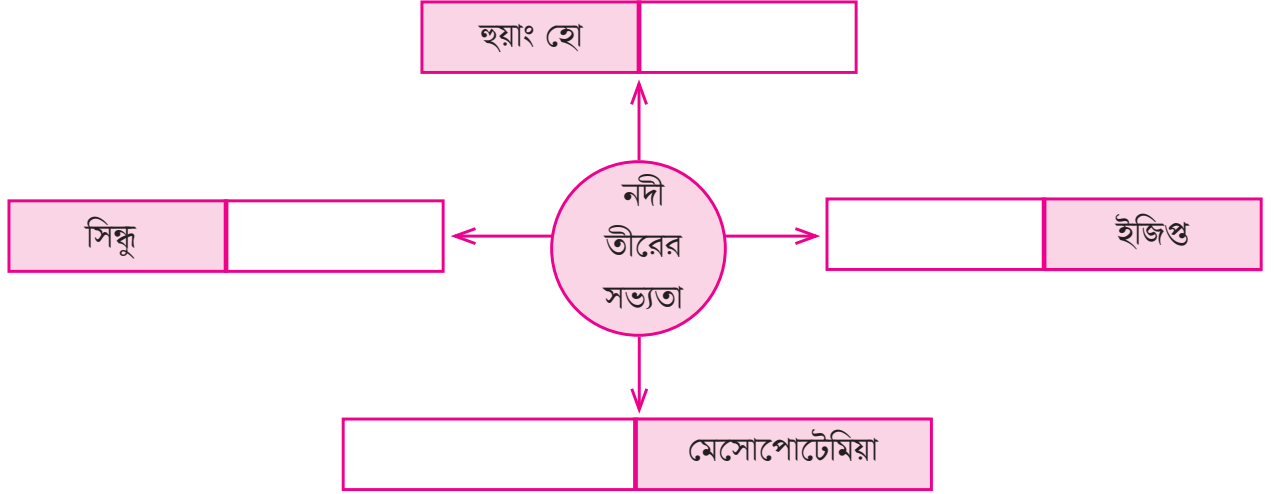
১. এক বাক্যে উত্তর লেখো:

- (অ) নবশ্ব যুগের সভ্যতার বিকাশ কোথায় হয়েছিলো?
- (আ) হড়প্পা সভ্যতার শ্রমিকেরা কি কি বস্তু তৈরী করতে কুশল ছিলো?

২. সংক্ষেপে উত্তর লেখো:

- (অ) হড়প্পা সভ্যতার নগর রচনা কেমন ছিলো?
- (আ) নীল নদীর তটীয় প্রদেশ খুব উর্বরক কেনো ছিলো?

৩. নিম্ন সংকল্পনা চিত্র পূর্ণ করো।



কার্য্য

ভারতের মানচিত্রে হুড়প্পা সভ্যতার স্থানগুলী দেখাও।

উপক্রম

(অ) তোমার আসে-পাসের সঙ্গীত শিল্পীদের সাক্ষাৎ

করো যাহারা বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র বাজায় এবং বাদ্য যন্ত্র-সম্বন্ধে বিস্তারিত জানকারী প্রাপ্ত করো।

(আ) নিজের আশে-পাশের বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো এবং তাহাদের ছেলেবেলার পারম্পরিক - খেলা সম্বন্ধে জেনে নাও।

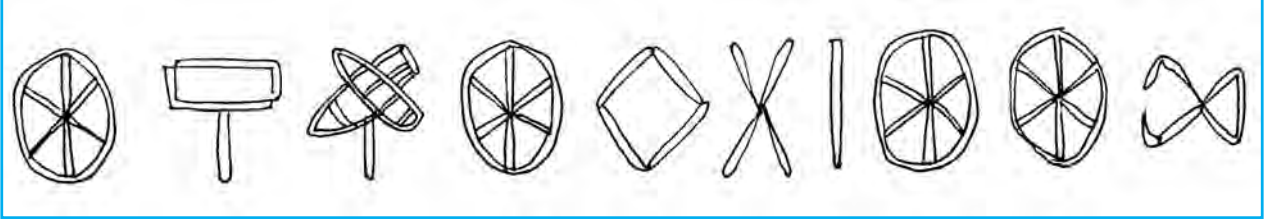
তোমরা কি ইহা জানো ?

মেসোপোটেমিয়া নগরীয় সভ্যতার মধ্যে চারটি মহত্বপূর্ণ সভ্যতা হলো এই : ১) সুমেরিয়ন ২) একোয়েডিয়ন ৩) বেবোলোনিয়ন ৪) এসিরিয়ন। প্রায় ২৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বে অক্কড় সাম্রাজ্যের উদয় হয়েছিলো। অক্কড় সাম্রাজ্যের সম্রাট সারগনের সময়ে হুড়প্পা সভ্যতা ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে ব্যবসা সমৃদ্ধ হয়েছিলো। বেবীলোন সম্রাট হুমুরাবীর শাসনকাল খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৯২ থেকে ১৭৫০ এর মধ্যে ছিলো। হুমুরাবী পৃথবীর প্রথম শাসক ছিলেন, যে নিজের প্রজাদের জন্য লিখিতো এবং সুব্যবস্থিত ন্যায় প্রণালী প্রদান করেছিলেন।

প্রাচীন ইজিপ্তের লোকেরা যে বিষয়ে বিশেষ উন্নতি করেছিলো, তাহার মধ্যে বিশেষ হলো তাদের ভবন নির্মাণ বিজ্ঞান। ওখানকার পিরামিড এবং মন্দিরের ভব্যতা দেখলে এই কথাটি আমাদের বিশ্বাস হয়ে যায়। তাহারা ভবন নির্মাণের জন্য মুখ্যরূপে মাটির কাঁচা ইট ও পাথরের ব্যবহার করতো। গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জলসেঁচের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা অনেক উন্নতি করেছিলো। ওখানে উত্তম প্রকারের জলপাতে নির্মাণ করা হতো। নীলা রঙ্গের প্রলেপ দেওয়া মাটির বস্তুর উৎপাদন, পপায়রাস নামক বনম্পতি থেকে কাগজ তৈরী করার কৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ওখানকার লোকেরা বিশেষ উন্নতি করেছিলো।

হড়প্পা ও মোহেঞ্জোদাড়ো এই স্থানে ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে উৎখান আরম্ভ হয় এবং হড়প্পা সভ্যতার খোঁজ হয়। উৎখাননে সর্বপ্রথম হড়প্পা সভ্যতার প্রকাশ পায়, অতএব উহাকে ‘হড়প্পা সভ্যতা’ নাম দেওয়া হয়।

সিন্ধু নদীর তীরে প্রাপ্ত হড়প্পা সভ্যতার লিপিতে লেখা উপলব্ধ আছে কিন্তু উহা পড়তে পারায় এখনও সফলতা প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব ওই লিপির ব্যবহার করে তখনকার ইতিহাস জানা সম্ভব না। কিন্তু হড়প্পা সভ্যতার নিজের একটি উন্নত লিপি ছিলো এবং উহা অন্য নগরীয় সভ্যতার কালখন্ডে প্রচলিত ছিলো, ইহা লক্ষ্য করে হড়প্পা সভ্যতার কালখন্ডকে ভারতীয় উপমহাদেশের ‘ইতিহাসপূর্ব কালখন্ড’ বলা হয়।

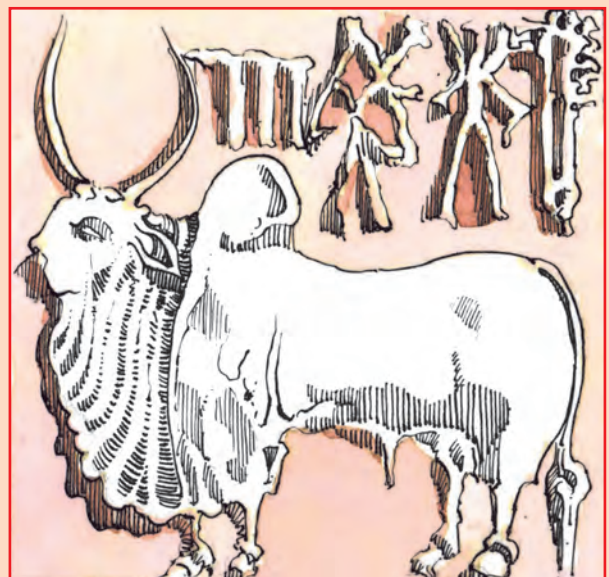
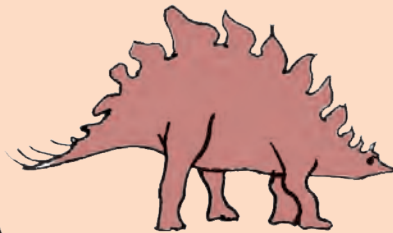
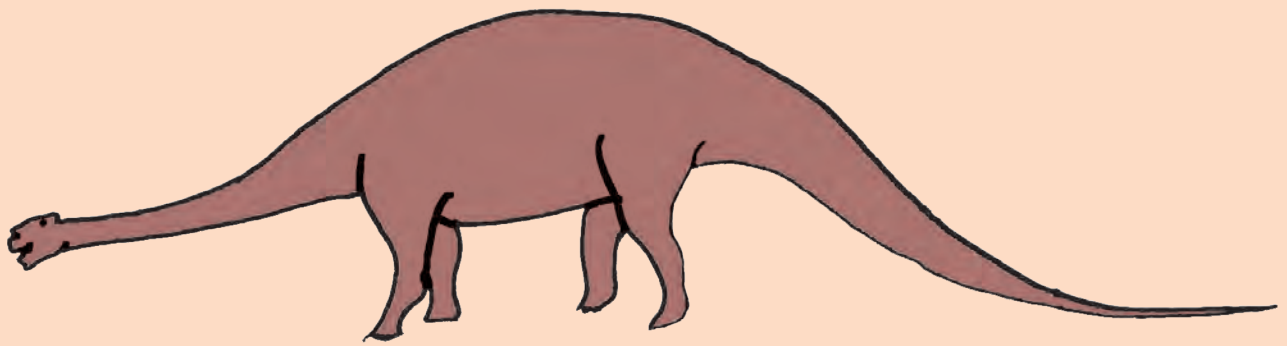


হড়প্পা লিপিতে লিখিত লেখা

প্রাচীন নগরীয় সভ্যতার কিছু বৈশিষ্ট্য :

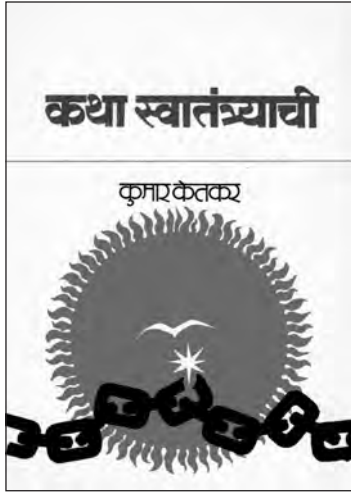
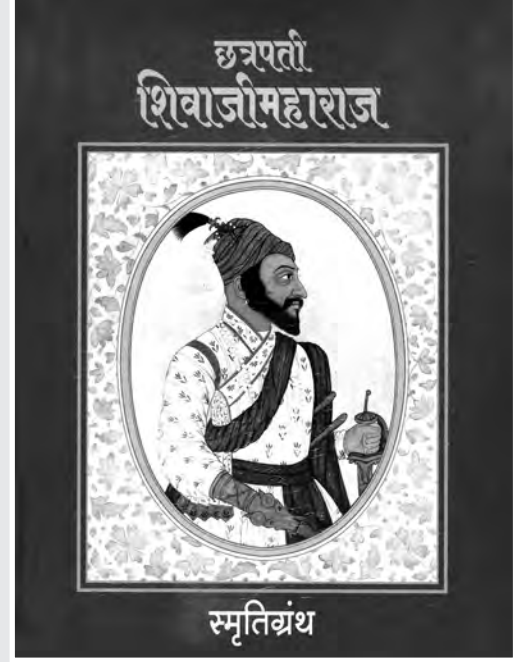
১) নদীর তীরে কৃষিপ্রধান স্থায়ী নিবাস (বস্তী) ২) তামা ও কাঁস্য ধাতুর ব্যবহার ৩) উন্নত তান্ত্রিক জ্ঞান ও বিশেষ ব্যবসায়িক কুশলতার উপর আধারিত ব্যবসা। ৪) জলবিতরণের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, বিকসিত জলসেঁচের পদ্ধতি ৫) খাদ্যাদ্য ও অন্য বস্তু নগর নিবাসিদের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী উৎপাদন। ৬) উন্নত লিপিতে লেখন শিল্প ৭) দূর-দূর পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যবসা ও উন্নত পরিবহন - প্রাণী দ্বারা টানা চাকায়ুক্ত বাহন, জলমার্গের ব্যবহার ৮) সুব্যবস্থিত নগর রচনা - সুরক্ষা প্রাচীর, ফরসিয়ুক্ত (পাকা) রাস্তা, অধিকারী বর্গের ও সাধারণ জন-গণের আলাদা-আলাদা আবাস ৯) উন্নত বাস্তবশাস্ত্র ও শিল্পকলা ১০) গণিত, ভূগোল এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান শাখার উন্নতি ও বিকাশ।





छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.



- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.



साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये
विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.



ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५१४६५, कोल्हापूर - ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०१३०, अमरावती - ☎ २५३०१६५



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে - ৪১১০০৪

परिसर अभ्यास भाग - २ इ. ५ वी (बंगाली माध्यम)

₹ 28.00

